সাক্ষরতা বুলেটিন

৫৫

সেপ্টেম্বর ২০১৬
আশ্বিন ১৪২২

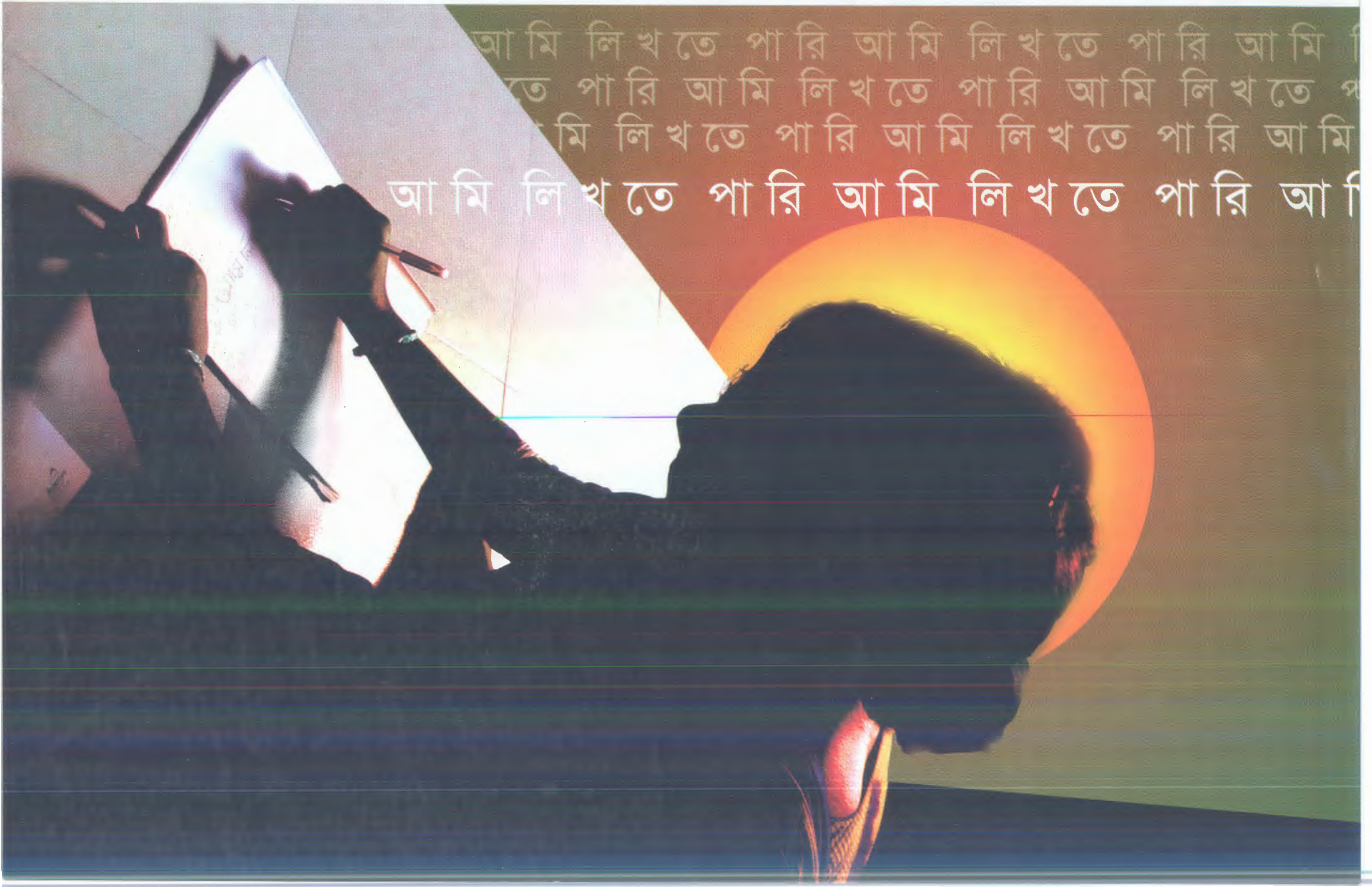

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৫৬ আশ্বিন ১৪২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

সূ চি প ত্র

৩ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৫ উপলক্ষে বাণী
ইরিনা বোকাভা, ইউনেস্কো মহাপরিচালক

৪ ড. একেএম খায়রুল আলম
প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষার একটি রূপকল্প

১৭ তপন কুমার দাশ
সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন: আশু করণীয়

২০ জাকির আহমদ খান কামাল
ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস ও আমাদের প্রত্যাশা

২২ বিশেষ প্রতিবেদন
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৫

২৫ তথ্যকণিকা

২৭ সংবাদ

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

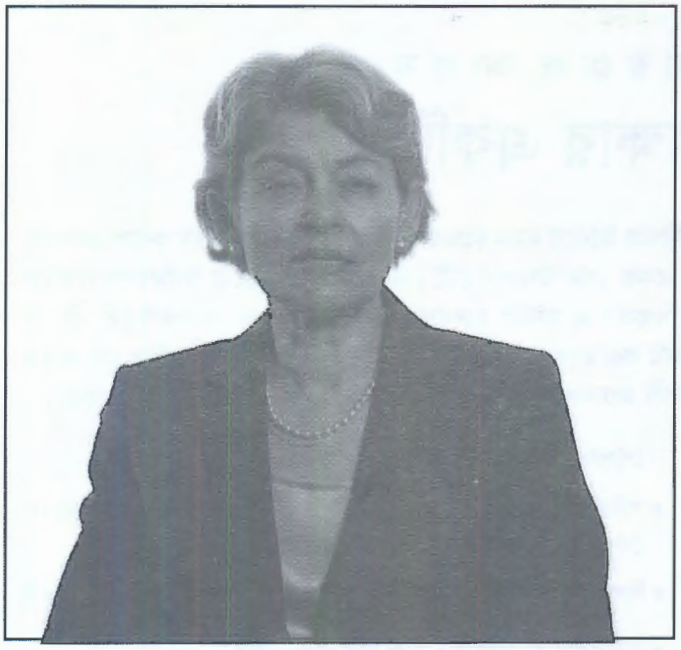

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৫ উপলক্ষে

বাণী

ইরিনা বোকাভা

ইউনেস্কো মহাপরিচালক

প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আমরা মানবাধিকারের অংশ হিসেবে, আত্মমর্যদার চালিকা শক্তি হিসেবে, টেকসই উন্নয়ন এবং সম্মিলিত সমাজসমূহের ভিত্তি হিসেবে সাক্ষরতার পতাকা উত্তোলন করে থাকি।

এ বছরের জন্য এই বার্তাটি সবিশেষ মূল্যবান, কারণ এখন আমরা আগামী ১৫ বছরের জন্য শিক্ষা এবং উন্নয়নের নতুন এজেন্ডা গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এই নতুন এজেন্ডার মধ্যে সাক্ষরতার বিস্তারকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ভদ্রস্থ কাজ সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নে অংশ নিতে সাক্ষরতা প্রতিটি নারী-পুরুষকে সক্ষম করে তুলতে পারে।

২০০০ সাল থেকে সারা বিশ্ব এ লক্ষ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও এখনও অনেক শক্ত চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এখনও ৭৫৭ মিলিয়ন বয়স্ক ব্যক্তি মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই হলো নারী। কোনোদিন বিদ্যালয়ে যায়নি এমন শিশু এবং কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছেই। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই সংখ্যা প্রায় ১২৪ মিলিয়ন। অপর দিকে, প্রাথমিক স্কুলে পাঠরত ২৫০ মিলিয়ন শিশু মৌলিক সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে।

আমরা কোনমতেই এই অবস্থা চলতে দিতে পারি না। প্রস্তাবিত স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা, সবার জন্য সমতাসম্পন্ন, মানসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমন্বিত জীবনব্যাপী চলমান শিক্ষা অর্জনের জন্য সাক্ষরতা দক্ষতা অপরিহার্য।

এটাই এ বছরের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে সবার জন্য ইউনেস্কোর বার্তা। সমাজে প্রতিটি নারী ও পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এখন আমাদের প্রয়োজন শিক্ষায় অধিকতর বিনিয়োগ এবং কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন, বৃহত্তর উন্নয়ন নীতিমালায় অধীনে সেই নীতিমালায় সাক্ষরতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা উদ্ভাবনী কৌশলের সাহায্যে সমাজে ইতিবাচক ও সম্মিলিত শক্তির জন্ম দেবে এবং নীতি প্রণয়নের সকল এলাকায় সম্প্রসারিত হবে এবং তা-ই হবে ন্যায়বিচারভিত্তিক ও মৈত্রীমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবাধিকার এবং আত্মমর্যাদায় সমুন্নত এবং উন্নততর সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণে সকল প্রচেষ্টায় তা একান্তই অবশ্যক।

(অনুবাদ: শফি আহমেদ)

ড. এ কে এম খায়রুল আলম

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষার একটি রূপকল্প

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য যে কী বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা নিচের দলিলটি অধ্যয়ন করলে বোধগম্য হবে। এ দলিলে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের একক কোন উপাদান নেই। এর জন্য অনেকগুলো উপাদানের সমন্বিত প্রয়োগ প্রয়োজন। তবে মান উন্নয়নের সব থেকে বড় উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। এ দলিলে মানসম্মত শিক্ষক উন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত মান ও যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। কী কর্মপন্থা গ্রহণ করলে মানসম্মত শিক্ষক তৈরি করা যাবে তা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। দলিলটির মূল লেখক ড. রবার্ট ক্রাফ্‌ট, কলারোডা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক । নিচের বর্ণনাটি অনেকাংশে রূপান্তরিত ভাষ্য। তবে মূল বক্তব্য অবিকৃত থেকেছে।

১৯৭১ সালের পর স্বাধীন দেশের উপযোগী করে প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বৃটিশ উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে পাকিস্তানী বৈষম্য নীতির যে পঙ্গু শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা ভেঙে ফেলে মুক্ত মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু একটি শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) গঠন করেন। ড. কুদরাত ই খুদার সে কমিশনের সুপারিশ এখনো বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক (শিক্ষানীতি-২০১০ দ্রষ্টব্য)। বস্তুত, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের জন্য স্বাধীনতার সূচনা লগ্নে যে সব কর্মপন্থা সুপারিশ করা হয়েছিল তা এখনো আমাদের মনোযোগ দাবি করে। শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়নের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন উপাদানের সমাহার এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যদি শিক্ষক পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত না থাকেন, শিক্ষকের শিখন-শেখানো কাজ যদি নিষ্ক্রিয় হয় এবং তিনি যদি আনন্দজনক শিখন সহায়কপরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারেন, তাহলে শিশুরা আবশ্যকীয় শিখন যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। এই শিক্ষাদর্শন বঙ্গবন্ধুর শিক্ষানীতিতে প্রাধান্য পায়। সে নীতিরই পুনঃপ্রতিফলন লক্ষ করা যায় বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এ। উপরে বর্ণিত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ কর্মসূচির রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

রূপকল্প

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকের জন্য যা যা প্রয়োজন:

- জীবনব্যাপী সার্বিক ও অবিরাম একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ;
- বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষভিত্তিক চাকুরীপূর্ব শিক্ষক-শিক্ষা ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন ;
- সক্রিয় ও শিশুবান্ধব শ্রেণীকক্ষ সৃষ্টির জন্য শিক্ষণ-শিখন কাজের পেশাগত উন্নয়ন;
- শিক্ষকমান ও শিক্ষার্থী-যোগ্যতাভিত্তিক অনুচিন্তননীতি ও গঠনতত্ত্বের প্রয়োগ এবং
- বিদ্যালয় ও সমাজের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন ।

উপরে বর্ণিত রূপকল্পটি বাস্তবায়ন করতে হলে এর একটি দার্শনিক ও প্রায়োগিক ভিত্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্বব্যাপী আধুনিক গবেষণায় দেখা যায় যে, শিক্ষকের সার্বিক বিকাশ সাধন করতে হলে তার পেশাগত যোগ্যতার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষক যেমন বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন তেমনি শিক্ষণবিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানেও প্রাজ্ঞ হবেন।

শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy)

গঠনবাদী শিক্ষাদর্শন ও অনুচিন্তনশীল শিক্ষণ মডেলের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষক-শিক্ষার ফ্রেমওয়ার্ক বা জাতীয় পরিকল্পনা এবং তা-ই শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান উন্নয়নের ভিত্তি। গঠনবাদী তত্ত্বের সহজ অর্থ হচ্ছে, শিশু, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দ তাদের মধ্যে বিদ্যমান ধারণা অথবা পূর্বজ্ঞান নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসেন। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র একগুচ্ছ জীবন অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের কাছে শিক্ষণের অর্থ ছোট বড় নির্বিশেষে

একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া মাত্র। স্কুলের শিশু ও শিক্ষক উভয়েই স্কুলের শিখন পরিবেশ ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পূর্বজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হন। নতুন শিখন অবশ্যই পূর্ববর্তী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত হবেন, যা তার পূর্ববর্তী জ্ঞানের বলবৃদ্ধিতে ও ধারণা প্রতিস্থাপনে সহায়তা করবে। যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সহযোগিতামূলক পদ্ধতিতে কাজ করে তখন তার সাহচর্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সৃষ্টি ও পুনর্সৃষ্টি হতে থাকে।

অনুচিন্তনমূলক শিক্ষণ মূলত একটি অনুসন্ধানী ও জিজ্ঞাসু শিক্ষণপদ্ধতি, যেখানে নৈতিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতি বস্তুত গঠনবাদী শিক্ষণ ধারা ও সমস্যা সমাধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ তত্ত্বে ব্যক্তিকে সেবাদান মনোবৃত্তির নৈতিকতায় উজ্জীবিত করে, বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের মেধাকে তাদের সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও লিঙ্গ পার্থক্য নির্বিশেষে শক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করে। চাকুরীপূর্ব শিক্ষার সূচনা থেকে শিক্ষকের পেশাগত জীবনব্যাপী কোর্সসমূহ ও কর্মশালাগুলো সতর্কভাবে আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়, যাতে সেগুলো মাঠ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। পিটিআই, সাব-ক্লাস্টার ও ইউআরসি পরিচালিত জীবনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে, নতুন শিক্ষকদের মধ্যে অনুসন্ধান স্পৃহা জাগিয়ে তোলা, যাতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মূল্যবোধের প্রয়োগে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারেন।

শিক্ষক শিক্ষা: চাকুরীপূর্ব ও সিপিডি প্রশিক্ষণে সার্বিক অভিযাত্রা

রবার্ট ক্রাফ্‌ট সার্বিকভাবে শিক্ষক-উন্নয়নকে দু'ভাবে ভাগ করেছেন; ক. শিক্ষক-শিক্ষা/DPEd (Diploma-in-Primary Education) খ. জীবনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ/CPD (Continuous Professional Development)। কেন এমন করা হয়েছে তার পটভূমি নিম্নরূপ:

বাংলাদেশে বর্তমানে বিশাল সংখ্যক শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে চাকুরীপূর্বকালীন শিক্ষণ-প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চাকুরীপূর্ব অথবা প্রারম্ভিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ , চাকুরীকালীন অথবা ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন (সিপিডি), ভিন্ন ভিন্ন নামে এ কোর্সগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় সব সময় খুব কঠিন। এমনটি হওয়ার পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। শিক্ষাবিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ ব্যতীত যেনতেনভাবে দীর্ঘকাল শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদায়ন দেওয়া হয়েছে। কখনো কয়েক মাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বছর পরে এদেরকে পিটিআইতে পাঠানো হয়েছে প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণের জন্যে। এখন সরকার এ অবস্থার অবসান চান। লক্ষ্যযোগ্য যে, এখনও বছরপ্রতি প্রায় ১৫০০০ বা আরও অধিক সংখ্যক নতুন শিক্ষক স্কুলে আসছেন, প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকও কর্মরত রয়েছেন। সুতরাং তাদের জন্য অনেক বছর ধরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে যে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন আসবে তা সহজ মনে হয় না। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিমাণগত অর্জন সম্ভব হয়েছে, তা সত্ত্বেও দুঃখজনক সত্য এই যে, তার সঙ্গে গুণগত মান অর্জনের যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার সাথে তেমন মিল নেই । সত্যি কথা বলতে কি, বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ও শিখন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান গবেষণায় নতুন প্রশিক্ষণ মডেল, কোর্স, শিক্ষকের মান, শিক্ষাক্রমের মান এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত পলিসি মডেল এবং পেশাগত দিক থেকে শিক্ষককে বুঝতে পারার জন্য শিক্ষকগণ কীভাবে প্রারম্ভিকভাবে নির্বাচিত হচ্ছেন, প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, বাছাই করা হচ্ছে, গ্রাজুয়েট ডিগ্রী ও সনদ পাচ্ছেন এবং সর্বোপরি পেশাগতভাবে কতটুকু উন্নত হচ্ছেন এবং পরিশেষে প্রাগ্রসর শিক্ষক সনদ পাচ্ছেন তা সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। প্রজেক্ট পলিসিতে সে মডেলের দৃশ্যরূপ (গ্রাফিকস) স্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ বাস্তবায়ন কালে চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ ও চাকুরীকালীন পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের শক্ত ভিত রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বলে মনে করা হলেও এখনই বলা মুশকিল যে, পূর্বে গৃহীত কার্যক্রমের ফল কতটুকু বিদ্যমান আছে। একটি পদ্ধতির সুস্পষ্ট ভূমিকা অন্বেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে কাজের পরিবর্তে কতকগুলো প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি টিকে আছে, অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেক ধারাবাহিক এড-হক কর্মশালা যেখানে সমগ্রতার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন বিষয়ের চর্চাই হয়েছে অধিক।

সব থেকে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় যে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন সমন্বিত উদ্যোগ নেই। সমন্বিত করতে পারে এমন অনেক উপাদানের (components) মধ্যে সামান্যই সমন্বয় সাধিত রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষাক্রম তৈরি করে, প্রকাশকরা পাঠ্যবই ও সংশ্লিষ্ট শিখন শেখানো সামগ্রী মুদ্রণ করে, নেপ (Acadamy of Primary Education) পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে এবং সাধারণত পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরির কাজে জড়িত থাকেন, পিটিআই সুপার ও ইনস্ট্রাক্টরগণ নেপ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। এতদসত্ত্বেও, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সুপারভিশন হয় সামান্যই। কাগজে-কলমে ইউআরসি (Upzila Resource Centre) পিটিআইতে রিপোর্ট করে থাকেন কিন্তু পিটিআই-এর সঙ্গে তাদেরও সামান্যই যোগাযোগ রয়েছে। অন্যদিকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট রিপোর্ট করেন এবং সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করলেও তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের দায়িত্ব সামান্যই পালন করেন। দৃশ্যত বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা চাকুরীপূর্ব ও চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে কিন্তু সকল পর্যায়েই খুব সীমিত তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের কাজ পরিচালিত হয়েছে।

শিক্ষক পদে যোগদানের প্রারম্ভ থেকে দীর্ঘ পেশাজীবনে শিক্ষকদের

পেশাগত উন্নয়নে সার্বিক পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। এ প্রতিবেদনের সর্বত্র পুরাতন পরিভাষা 'চকুরীকালীন প্রশিক্ষণের' পরিবর্তে 'ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন' ব্যবহার করা হয়েছে। এই পরিভাষা' টেকনিশিয়ানের ট্রেনিং' এর পরিবর্তে পেশাজীবীর জীবনব্যাপী অব্যাহত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। পিটিআই কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষণে 'শিক্ষক-প্রশিক্ষণ'(Teacher Training)-এর পরিবর্তে 'শিক্ষক-শিক্ষা' (Teacher Education) পরিভাষাটি ব্যবহার করা হচ্ছে ।

বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষকের গুণগত মানের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতার মান বৃদ্ধি ও বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত করে একটি যৌক্তিক রূপকল্প এবং তাত্ত্বিক বা দার্শনিক- কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। তাত্ত্বিক বিষয়ের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হলো।

চাকুরীপূর্ব এবং পেশাগত উন্নয়নের সার্বিক-তত্ত্ব

ডিপিএড : বিদ্যালয়ে বাস্তব (school practicum) শিক্ষণ ও শিখনসহ পিটিআইতে ১২ মাস এবং ৬ মাস নিজ স্কুলে অভ্যন্তরীণ (Internship) অনুশীলন

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন তখন থেকে আরম্ভ হয় যখন থেকে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশনের শিক্ষার্থীরা অনুশীলনী পাঠ (Practice Teaching) শুরু করেন। পেশাজীবনের শেষ পর্যন্ত দক্ষতা উন্নয়ন অব্যাহত রাখেন। সাব-ক্লাস্টার হচ্ছে চাহিদা-নির্ভর সিপিডি-এর প্রধান উপাদান যেখানে প্রধান শিক্ষক ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শিক্ষকগণ বিজ্ঞ পরামর্শ প্রদান ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারও চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা অব্যাহত রাখবে। সকল শিক্ষককে অবশ্যই স্কুলভিত্তিক পাক্ষিক পেশাগত উন্নয়ন সভায় (Professional Development Meeting) যোগদান করতে হবে। বছরে প্রতি তিন মাস অন্তর চারটি চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ হবে ইউআরসি-তে এবং এ সব প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হবে চাহিদাভিত্তিক। তাহলে শিখন-শেখানো হবে সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক।

সক্রিয় শিক্ষণ ও অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো

মনোবিজ্ঞানী ডেভিড কোলব (১৯৮২) শিখন প্রক্রিয়ার একটি দৃশ্যময় মডেল (পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য) উন্নয়ন করেছেন। তাঁর মডেলে তিনি কেবলমাত্র শিক্ষকের চাকুরীপূর্ব শিক্ষা ও চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নয় বরং শ্রেণিকক্ষে শিশুদের জন্য উপযুক্ত শিখন পরিবেশ রচনা করা বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে শিক্ষকদের চাকুরীপূর্ব শিক্ষণ-আচরণে পরিবর্তন আনয়নের জন্য বিষয় উপস্থাপনা, বক্তৃতা শ্রবণ অথবা বিমূর্ত তত্ত্ব পঠনের ধারণাকেই যথেষ্ট বিবেচনা করেননি; এ রকম তত্ত্ব সমর্থনও করেননি।

আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষা মডেলে ৪টি উপাদান বিবেচনায় আনতে হবে। কখনো যদি ৪টি উপাদানের একটি দ্বারা আরম্ভ করা হয়, তাহলে নতুন শিক্ষকদের জন্যে শ্রেণিকক্ষে প্রকৃত পাঠদানের অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে হবে। শ্রেণিকক্ষে কমপক্ষে স্বল্প সময়ের জন্য পাঠদান অভিজ্ঞতা না থাকলে শ্রেণিকক্ষে অর্থপূর্ণ কাজ করা দূরে থাক, স্কুলে কী ঘটছে তাও বোঝা সম্ভব নয়। অনুচিন্তনমূলক ও গঠনতাত্ত্বিক মডেলের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জার্নালে, পর্যবেক্ষণ ফরমে এবং কাগজের মাধ্যমে নিজের অবস্থান জানার সুযোগ থাকতে হবে। এ ছাড়াও সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষার্থী দলে কাজ করার সময় কিংবা সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে অনুচিন্তনের মাধ্যমে আরও জানার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ রকম একাডেমিক পরিবেশেই কেবল শিশুবিকাশ সম্পর্কিত বিমূর্ত তত্ত্ব, শিক্ষাদর্শন, বাংলাদেশী সমাজ বাস্তবতা অথবা মূল্যায়ন বিষয়ক পঠনপাঠন ও আলোচনা প্রশিক্ষণার্থী বা শিক্ষকদের নিকট প্রকৃত অর্থে মূর্ত হয়ে উঠবে। পরিশেষে বলা যায়, যা কিছু দেখি, পড়ি, পর্যবেক্ষণ বা তত্ত্বরূপ দান করি তা একবার হলেও অনুশীলন করার সুযোগ থাকতে হবে। সক্রিয় নিরীক্ষামঞ্চে ভাবাশ্রয়ী তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত হলেই তত্ত্ব অর্থপূর্ণ হয়। অর্থাৎ প্রয়োগেই তত্ত্ব বাস্তব ভিত্তি পায়। এ সম্পর্কে নিম্নে কোলবের মডেল প্রদান করা হলো:

শিক্ষক- শিক্ষণে কোলবের (Kolb's) মডেল

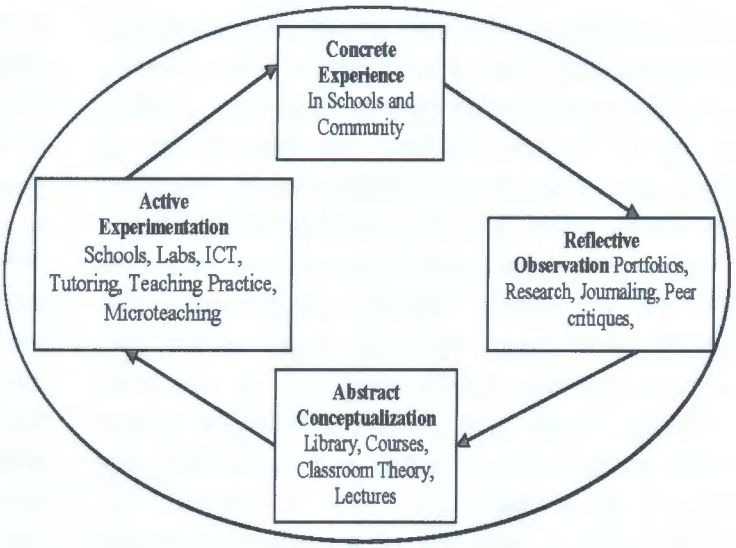

অনুচিন্তনমূলক শিক্ষণ অনুশীলন

শিক্ষকদের অনুচিন্তন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্যে বিগত ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে অনুচিন্তনমূলক অনুশীলনের ধারা উন্নয়ন করা হচ্ছে। কী ধরনের অনুচিন্তনমূলক অনুশীলন করা যেতে পারে নিচের তালিকা থেকে তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে:

সক্রিয় শিখন: এটি শিখন ও অনুচিন্তনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কোন সমস্যা শিক্ষার্থী / শিক্ষকের সামনে এলে স্বীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা নিষ্পন্ন করা হয়। এ পরিস্থিতি শিখনকে সক্রিয় করে তোলে।

একাডেমিক (কিনিক্যাল) সুপারভিশন: এটি একটি প্রকৃত অনুচিন্তনমূলক কর্মসূচি। এ পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধায়কের শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শনের পূর্বে ও পরে ফলাবর্তন, আলোচনা এবং পুনরালোচনা করার সুযোগ রয়েছে।

কোর্স এবং একক পুনরালোচনা: এটি প্রধান শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক এ দু'জনের মধ্যে পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে যিনি পাঠ বা অধ্যায়ের পরিকল্পনা করেছেন তাকে ফলাবর্তন প্রদান করা হয়।

নাটক বা ভূমিকাভিনয়: নাট্যাভিনয় বা ভূমিকা অভিনয় মূলত গল্প বলার মতো। শিক্ষণ ও শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থীগণ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে নিজের ভূমিকা বা ঘটনার চরিত্রের ভূমিকা উপস্থাপন করেন। এর ফলে বিমূর্ত বিষয় মূর্ত হয়ে ওঠে।

মাইন্ড ম্যাপিং এবং ব্রেন স্টর্মিং : উদ্ভূত কোন ধারণা ও সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তিতে পৌঁছানোর একটি মনো-নকশা বা মানচিত্রের আদলে অনুচিন্তন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান, ঘটনার স্পস্টীকরণ ও পুনঃঅবয়ব প্রদান করা যায়। এটা একটি শিক্ষণ পদ্ধতি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জড়তা দূরীকরণ, সৃজনশীল চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও জটিল সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

অনুচিন্তনমূলক শিক্ষণ অনুশীলন/স্ব-অনুচিন্তন: অনুচিন্তনমূলক শিক্ষণ অনুশীলন/স্ব-অনুচিন্তন অনেক কিছু নিয়ে এবং নানা পথে তা পরিচালিত হতে পারে। এর একটি যেমন সক্রেটিসের সংলাপ (dialogues) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুব জনপ্রিয়। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে এ মহান দার্শনিকের তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পদ্ধতি সৃজনশীল কাজে ব্যবহারের সুযোগ করা গেলে শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষণ অনুশীলনের সময় তাদের ধারণা, চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের উপর অনুচিন্তন করতে পারেন।

গল্প বলা : গল্প বলা সকল সংস্কৃতির মানুষের জীবনে যোগাযোগের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। এ মাধ্যমটি শিক্ষক শিক্ষণে, মৌখিক ও লিখিত উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। শোনা ও বলার ক্ষেত্রে এবং অনুচিন্তনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনে এ পদ্ধতি যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে।

এ্যাকশন রিসার্চ: এ্যাকশন রিসার্চ একজন পেশাজীবীর নিজের অনুশীলনের আত্মানুসন্ধানকে বুঝায়। পরিকল্পনা, কার্যক্রম পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ এবং এটি অনুচিন্তনের একটি আবর্তিত প্রক্রিয়া বিশেষ।

ঘটনার বিশ্লেষণ/ কেইস স্টাডি: জটিল ঘটনার বিশ্লেষণ/ কেইস স্টাডি বর্তমানে মেডিকেল, শিক্ষা, আইন, এবং ব্যবসা নানা ফ্যাকাল্টির পরিভাষা হিসেবে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়। শিক্ষক-শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ ও অনুশীলনমূলক জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য শিক্ষণের ঘটনাবলি প্রামাণিককরণে ও বিশ্লেষণে এ পরিশব্দ ব্যবহৃত হয়। অনুচিন্তনমূলক অনুশীলনের এটি একটি কাঠামো, যা জার্নাল সংরক্ষণের আদলে এবং ভিডিওর মাধ্যমে কৃতিত্বের সাথে ব্যবহৃত হয় ।

জার্নাল প্রকাশ: জার্নাল প্রকাশের সাথে কারো নিজের ও অন্যান্যদের শিক্ষণ অনুচিন্তনের সম্পর্ক থাকে, তাছাড়া জার্নাল শ্রেণিকক্ষে আচরণগত পরিবর্তন আনয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। অন্য কথায়, অনুচিন্তন এখানে ক্রমান্বয়ে কর্মে পরিণত হয়।

জোড়ায় পর্যবেক্ষণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন: যখন সহকর্মীবৃন্দ একে অপরের শিক্ষণ জোড়ায় পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার গঠনমূলক আলোচনা করেন। জাপানে Lesson Study-তে এটি একটি নিয়মিত কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শিক্ষণ পোর্টফোলিও: শিক্ষক/শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ-বিশেষজ্ঞতার প্রমাণসমষ্টি দিয়ে পোর্টফোলিও সাজানো থাকে। যার মধ্যে পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষণ উদ্ভাবন, ব্যক্তিগত শিক্ষণ দর্শন, কৃতিত্ব এবং শিখন-শেখানো কাজে পেশাগত উন্নয়নের প্রমাণ এতে রক্ষিত থাকে।

সমালোচক বন্ধু নিয়োগ: এমন একজন সহকর্মী বা বাইরের কোন কোন উৎসাহী ব্যক্তিকে নিয়োগ করা, যিনি সর্বদা শিক্ষকের সকল পাঠদান সংশ্লিষ্ট কাজের বিশ্বস্ত শ্রোতা ও সমালোচক ।

পরিবীক্ষণ: একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক বা সিনিয়র সহকর্মী দ্বারা নতুন শিক্ষকের প্রারম্ভিক জীবনে অনুশীলনী পাঠদানের সময় তার কাজ তত্ত্বাবধান ও তাকে সহায়তা প্রদান করা বুঝায়।

স্বীয় পেশাগত দায়বদ্ধতা: একজন পেশাজীবী হিসেবে শিক্ষক নিজেই নিজের কাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। তাদের কাজ তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর, প্রধান শিক্ষক

বা কোন তত্ত্বাবধায়কের দ্বারা এককভাবে সম্ভব নয়।

১.চাকুরীপূর্ব শিক্ষক-শিক্ষা

ক. ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত নতুন শিক্ষকদের প্রারম্ভিক যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য ডিপিএড কোর্স একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ। বহু ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সিইনএড কর্মসূচির কাঠামো থেকে এর তাৎপর্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। পিটিআই-তে যেভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়, তার সঙ্গে বাস্তব অনুশীলন সংযুক্ত করে ডিপিএড কোর্স সাজানো হয়েছে। এ কোর্সের রূপকল্পে একটি তত্ত্বকে কাঠামো দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শিশুরা একটি সামগ্রিক শিখন পরিবেশে সৃজনশীল ও গঠনবাদী শিক্ষণ-দর্শনের আলোকে লেখাপড়া করবে; এ লক্ষ্যে অনুচিন্তনমূলক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক-শিক্ষা পরিচালিত হবে। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে শিক্ষকগণকেও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে মানসম্মত হতে হবে। এ আলোকে শিক্ষক-শিক্ষা কার্যক্রম সাজানো হয়েছে। বলা যায়, অতঃপর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-উদ্ভূত এক সেট মান (standards) ও যোগ্যতার (competencies) নিরিখে উপরে বর্ণিত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত ও মূল্যায়িত হবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের শিখনের সাথে বারংবার সম্পর্কিত করতে পারবেন। কর্মসূচি-কাঠামো অনুযায়ী একক সময় পরিধিতে পিটিআই-এ ও অন্য সময়ে প্রশিক্ষণ স্কুলে বিকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষণ-শিখন অনুষ্ঠিত হবে বলে শিখনের মাঝে একটি যৌথক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে যাবে, ফলে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের মধ্যে একটা সদর্থক পরিবেশ তৈরি করবে। সামেটিভ মূল্যায়নসমূহের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিভিন্নতা থাকে, এ কারণে বর্তমান কোর্সে ক্রিয়া ও অনুচিন্তন অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং ফরমেটিভ মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ধরনের একটি উদ্ভাবনমূলক শিক্ষক-শিক্ষার প্রবর্তন করতে হলে ব্যবস্থাপনা-সামর্থ্য বৃদ্ধি করা অর্থাৎ স্টাফ, শিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে ICT-সহ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। এ চাহিদার বিষয় ও তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যসহ সকল কোর্স উপাদানের বিস্তৃত নীল নকশা এবং অপরিহার্য সহায়ক সম্পদ সমাবেশ করার প্রয়োজন হবে।

ডিপিএড কোর্সের নীতিমালা ও মূলনীতির যৌক্তিকতা

- সিইনএড কোর্স শিক্ষকদের জ্ঞান ও উপলব্ধি বৃদ্ধির জন্য প্রার্থিত সাফল্য অর্জনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় এর পরিবর্তে ডিপিএড কোর্স প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রথাগত অবরোহী শিক্ষণ-পদ্ধতি (didactic teaching methods) অনুসরণ করায় বিষয়বহির্ভূত কাজ, মুখস্তকরণ, এবং পুনরাবৃত্তিকরণের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষকের মাথা থেকে শিক্ষার্থীর মাথায় প্রেরিত হয়, এর ফলে শিশুদের শিখন-সম্ভাবনা বিঘ্নিত হয়।
- জ্ঞান তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয় যখন তা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিত হয়। সর্বোত্তম শিক্ষা হচ্ছে কাজের দ্বারা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করা।
- অংশগ্রহণমূলক, মিথস্ক্রিয়া এবং সৃষ্টিশীল পদ্ধতিতে কীভাবে নতুন জ্ঞান সৃজন (Construct) করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষক অবশ্যই তার শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তুলবেন।
- শিক্ষক অবশ্যই তার শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা জানবেন এবং তাদের জ্ঞানসংক্রান্ত (Cognitive) সামাজিক (Social) এবং আবেগিক (Affective) ক্ষেত্রের শিখন চাহিদা পূরণ করবেন।
- শিক্ষক অবশ্যই জানবেন কীভাবে সহায়ক ও একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরি ও সংরক্ষণ করতে হয়।
- শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষাক্ষেত্রে সব থেকে বড় সম্পদ। শিক্ষককে ঠিক সেভাবে শিখন-সঞ্চালক (Learning facilitator) হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। প্রাথমিক (প্রাক-প্রাথমিকসহ) শিক্ষণ একটি দক্ষতাপূর্ণ কাজ। এ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণ।
- শিক্ষণতাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার জ্ঞানের সমন্বিত রূপ হলো শিক্ষক-শিক্ষা। প্রায় কমবেশি সমপরিমাণ পিটিআইভিত্তিক তত্ত্বীয় ও বিদ্যালয়ভিত্তিক বাস্তব শিক্ষণ অভিজ্ঞতা সমীকৃত এবং মূল্যায়ন ও শিক্ষণের সঙ্গে বিভিন্ন রকম জ্ঞানকে সংযুক্ত করে ডিপিএড কোর্স কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীরা তাদের অনুশীলনের উপর অনুচিন্তন করে শিখবে।

১.১০ শিক্ষকদের জন্য পেশাগত জ্ঞান (Professional Knowledge), পেশাগত অনুশীলন (Professional Practice) এবং পেশাগত মূল্যবোধ (Profesional Values) ও সম্পর্ক (Relationship) স্থাপন ও উন্নয়ন করা জরুরি। শিখন ফল, পেশাগত মান, যোগ্যতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষভিত্তিক অনুশীলন উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করা উল্লিখিত শিক্ষকযোগ্যতা ও দক্ষতা নির্বাচনের লক্ষ্য।

১.১১ পেশাগত জ্ঞানকে (Professional Knowledge) বিষয়জ্ঞান (Subject Knowledge), শিক্ষণবিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান (Pedagogic Knowledge) এবং শিক্ষাক্রম বিষয়ক জ্ঞান (Curriculum Knowledge) এ তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়। এ শ্রেণিকরণ মূলত শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কোর্সের ভিত্তিস্বরূপ।

উদ্দেশ্যাবলি (Objectives)

একজন দক্ষ শিক্ষকের অত্যাবশ্যক গুণাবলি, নৈপুণ্য ও জ্ঞান কী হতে পারে তার উপর ভিত্তি করে নিচে পেশাগত জ্ঞান, অনুশীলন ও মূল্যবোধের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হলো:

পেশাগত জ্ঞান (Professional Knowledge)

১. প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পূর্ণ পরিধি কার্যকর ও আস্থার সঙ্গে শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের জন্য বিষয়জ্ঞানের পরিকল্পনা ;

২. প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পূর্ণপরিধি কার্যকর ও আস্থার সঙ্গে শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের জন্য শিক্ষণবিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের পরিকল্পনা ;

৩. জাতীয় প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রমের কাঠামো, বিষয়, যোগ্যতাসমূহ এবং মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ;

৪. কার্যকর ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য শিশুবিকাশ ও শিক্ষণতত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকা ;

৫. শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবহৃত বিধিবিধান ও নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত থাকা ।

পেশাগত অনুশীলন (Professional Practice)

১. শিক্ষার্থীদের চাহিদার আলোকে পৃথক পৃথক শিক্ষণতত্ত্ব ও শিক্ষণপদ্ধতি অনুসরণে পাঠপরিকল্পনা ও পাঠপরিচালনার সক্ষমতা থাকা ;

২. সকল শিক্ষার্থীর উচ্চ-প্রত্যাশা উপলব্ধি করতে পারা ;

৩. যোগাযোগ দক্ষতা– সকল শিশু যাতে শিখনের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে সে জন্য উপস্থাপন করতে পারা ;

৪. যোগাযোগ দক্ষতা– বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতা ও যথাযথ প্রশ্ন করার কৌশল জানা এবং শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মাধ্যমে একটি শিখন পরিবেশ (scaffold of learning) তৈরির সক্ষমতা থাকা ;

৫. নিরাপদ, যত্নশীল, সৃজনশীল, উদ্বুদ্ধকরণ ও চ্যালেঞ্জিং এবং একীভূত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতা থাকা;

৬. পাঠসংশ্লিষ্ট ও কার্যকর এবং ICT-সহ শিক্ষোপকরণ পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবহারের দক্ষতা থাকা ;

৭. শিক্ষার্থীদের শিখন এবং একীভূত শিক্ষা সম্প্রসারণে সমর্থন ও সহায়তাদানে পরিকল্পনা জ্ঞান ও মূল্যায়ন পরিচালনা দক্ষতা থাকা ।

পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন (Profesional Values & Relationship)

১. শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যবহারে সমতাবিধান, একীভূতকরণ ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন;

২. শিক্ষক অনুচিন্তন অনুশীলন ও ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে দায়বদ্ধ থাকবেন ;

৩. শিক্ষক সমাজের সকল সদস্যদের সঙ্গে কার্যকরভাবে একত্রে কাজ করতে দায়বদ্ধ ও সক্ষম হবেন ;

৪.সহকর্মীদের সাথে পেশাগত সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবেন।

৩. প্রাথমিক শিক্ষায় ডিপিএড-এ প্রকাশিত শিক্ষকদের পেশাগত মান (Professional Standards):

৩.১ প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন দক্ষতা অবশ্যই নিয়মানুগভাবে উন্নয়ন করতে হবে ও মূল্যায়িত হবে। এ লক্ষ্য মনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিপিএড সনদপ্রাপ্ত একজন শিক্ষকদের জন্য নিম্নোক্ত এক সেট মান (Standards) উন্নয়ন করা হয়েছে।

পেশাগত জ্ঞান (Professional Knowledge)

- প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সকল দিক কার্যকর ও আস্থার সঙ্গে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়-জ্ঞান থাকবে ও তিনি তা প্রদর্শন করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম-যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক শিক্ষাক্রম-যোগ্যতাসমূহের শিক্ষণ-কৌশল বিষয়ে জানবেন এবং তা যথাযথ ও প্রাসঙ্গিকভাবে তা উপস্থাপন করতে পারবেন;
- প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং এর অন্তর্গত যে যোগ্যতাসমূহ শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় তার পাঠদান কৌশল সম্পর্কে শিক্ষক জ্ঞান লাভ করবেন এবং প্রদর্শন করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের শিখন ও বিকাশের প্রধান প্রধান তত্ত্বসমূহ (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিখন চাহিদা ও বিকাশসহ) এবং কীভাবে তত্ত্বসমূহ সর্বোত্তমভাবে ব্যবহৃত হয় তা জানবেন ও প্রদর্শন করতে পারবেন।
- শিক্ষকগণ যে সব শিশুর পাঠদান করে থাকেন, তাদের প্রত্যেকের জ্ঞানের প্রকৃতি জানবেন ও বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রাসঙ্গিক আইনগত প্রয়োজনীয়তা (Legal requirements) যেমন শিশুশ্রম আইন, বিধিমালা, বিদ্যালয় পরিচালনা পলিসি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইন জানা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে কাজ করার সময় তাদের চাহিদা উপলব্ধি করতে ও বর্ণনা করতে পারা ।

পেশাগত অনুশীলন (Professional Practice)

- বিভিন্ন ধরনের পাঠপরিকল্পনা তৈরি করতে পারা যা সকল শিশুকে প্রেষণালাভে ও পাঠে মনোযোগী হতে সহায়তা করবে; ফলে তারা কার্যকর ভাবে শিখতে পারে;
- সকল শিশুর উচ্চ প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করা যাতে তারা তাদের ব্যক্তিক চাহিদা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল্যারোপ ও সম্মান করতে

শেখে;

- সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ কার্যকরভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা, যাতে শিখনফল, শিখন পদ্ধতি ও পাঠের বিষয় শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়;
- প্রশ্নপদ্ধতি এবং আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করে শিখনের অগ্রগতি সাধনের জন্য কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা;
- সকল শিক্ষার্থীর জন্য উদ্দেশ্যমুখী, সার্থক, নিরাপদ এবং একীভূত দৈহিক ও সামাজিক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রাপ্ত সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শিখনে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে ;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সদর্থক ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় কৌশল বর্ণনা করতে পারা ;
- শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও বিদ্যালয়ের শিখন পরিবেশ শিক্ষার্থী-বান্ধব করার জন্য বাস্তব, সদর্থক এবং একীভূত শ্রেণি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে পারা;
- শিখন পরিবেশ যাতে একই সঙ্গে কার্যকর ও একীভূত হয় এ জন্যে যথাযথ এবং সহজলভ্য শিক্ষোপরণ নির্বাচন ও ব্যবহার করা ;
- সহজলভ্য সম্পদ ব্যবহার করে নতুন শিক্ষণ-উপকরণ উন্নয়ন, গঠন এবং ব্যবহার করা ;
- শিক্ষণকে সহায়তা করার জন্য ITC-সহ অন্যান্য প্রযুক্তির পূর্ণ ও যথাযথ ব্যবহার করা ;
- বিভিন্ন ধরণের মূল্যায়ন-কৌশল পরিকল্পনা ও ব্যবহার করা ;
- শিক্ষার্থীদের সময়মত মৌখিক ও লিখিত ফলাবর্তন (Feed back) ও ফলানুসরণ (Feed up)করা ;
- বিভিন্ন অর্জন যাচাই (Assessment) এবং শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা মূল্যায়ন করা এবং তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষা পরিকল্পনা ও এর উন্নয়ন সাধন করা ।

পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন (Profesional Values & Relationship)

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পূর্ণ সম্ভাবনাশক্তি (Potentials) বিকাশের জন্য সমতা, ন্যায়বিচার ও একীভূতকরণের প্রতি দায়বদ্ধতা (Commitment) প্রদর্শন ও অনুশীলন করা ;
- সমগ্র শিক্ষকতা জীবনব্যাপী পেশাগত উন্নয়ন ও জটিল অনুচিন্তনমূলক অনুশীলনের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করা;
- পিতামাতা, অভিভাবক ও সমাজের সঙ্গে একত্রে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষকদের কাজ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও প্রবণতা প্রদর্শন করা;
- সহকর্মীদের সঙ্গে টিম-সদস্য হিসেবে কাজ করার প্রবণতা প্রদর্শন।

কর্মসূচি কাঠামো (Programme Structure)

পিটিআইভিত্তিক নিম্নোক্ত ১২টি কোর্স সন্নিবেশিত করে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন এর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে:

এবং আরও দুটি স্কুল প্লেসমেন্ট কোর্স যথা:

- টিচিং প্লেসমেন্ট- ক
- টিচিং প্লেসমেন্ট -খ

এ দুটি কোর্সের সময় বরাদ্দ শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষণ ও স্কুলভিত্তিক বাস্তব শিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের সমান হবে।

- পিটিআইভিত্তিক কোর্সসমূহ (৪র্থ টার্মের শেষে সংক্ষিপ্ত প্রফেশনাল স্টাডিজ কোর্স ব্যতীত) এবং প্রথম প্লেসমেন্ট কোর্স, ডিপিএড কর্মসূচির প্রথম তিন টার্ম- পরিসরে পরিচালিত হবে।
- অতঃপর পরিচালিত হবে, একটি দীর্ঘ, সর্বশেষ,অর্ধ বৎসরব্যাপী শিক্ষণ অনুশীলনমূলক চূড়ান্ত প্লেসমেন্ট কোর্স । শিক্ষণবিজ্ঞান এবং পেশাগত কোর্সসমূহ তাত্ত্বিক ও বাস্তব শিখন অভিজ্ঞতায় সুসঙ্গতিপূর্ণ ও সমন্বিত হতে হবে। পেশাগত স্টাডিজ কোর্স এবং সকল শিক্ষণবিজ্ঞানবিষয়ক কোর্সসমূহ দু'ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। কোর্সসমূহ প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক উভয় বয়সী শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য একটি একীভূত পরিবেশ রচনা করবে।
- পেশাগত স্টাডিজ কোর্সে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, শিশুশিক্ষা ও শিশু বিকাশতত্ত্বের ভূমিকা, কার্যকর শিক্ষণ এবং মূল্যায়ন অনুশীলনের ব্যাখ্যা ও তার অন্তর্লীন নীতিকাঠামোসহ প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিমূল হিসেবে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং পেশাগত মূল্যবোধের পরিচিতি থাকবে।
- বিষয়জ্ঞান কোর্সে (Subject Knowledge Course) একটি শক্তিশালী জ্ঞান ও উপলব্ধির ভিত্তি থেকে প্রতিটি বিষয় শিখনে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সমর্থ করে তুলবে।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষণবিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান কোর্স (Pedagogical Knowledge) প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের বিষয় এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধিতে প্রশিক্ষণার্থীদের সমর্থ করে তুলবে।
- প্রকাশধর্মী কলাবিদ্যা কোর্সে (Expressive Arts Course) চারু ও কারুকলা,সংগীত, নাটক এবং শারীরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- পিটিআইভিত্তিক শিক্ষণ-কোর্সটি মিথস্ক্রিয়াধর্মী ও অংশগ্রহণমূলক হওয়ায় এ কোর্সে শিক্ষণবিজ্ঞান অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের সকলে সকলের সমকক্ষ হওয়ার মডেল রূপে গণ্য হবে।
- এ কোর্স মূল্যায়নে (Assessment) জ্ঞানতত্ত্বের এমন কিছু প্রতিফলন ঘটাবে

যা সক্রিয়, বিষয়ানুগ ও বর্ণনাপ্রাসঙ্গিক।

- প্রচলিত শিক্ষার্থী প্লেসমেন্ট পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের পূর্ণ মেধাবিকাশে যথেষ্ট নয়। বর্তমানে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতার স্তর মূল্যায়িত হবে তার জন্য নির্ধারিত মানের আলোকে এবং পর্যবেক্ষণ ও ছোট দলীয় কাজ থেকে শেষে পূর্ণ শিক্ষকে রূপান্তরিত হবে। এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের অনুচিন্তনমূলক অনুশীলনের দক্ষতা উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়।
- প্লেসমেন্টকৃত শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করবেন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট। স্কুলের শ্রেণীশিক্ষককে একজন বিজ্ঞ-পরামর্শক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রধান শিক্ষক একজন সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, তবে কোন সমস্যা দেখা দিলে পিটিআই-এর সংগে যোগাযোগ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক-আর্থিক ও শিক্ষাগত অবস্থান জানা গেলে একটি একীভূত শিখন-পরিবেশ তৈরি করা যায়, এ জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের স্কুলের সদস্যবৃন্দ, পিতামাতাসহ স্থানীয় কম্যুনিটি সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
- বাস্তব শিক্ষণ অভিজ্ঞতাকে গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের নির্ধারিত মান (Standards) হিসেবে মূল্যায়ন করা হবে। ডিপ্লোমা লাভ ও স্নাতক শিক্ষক মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের সকল প্রকার মান (All Standards) ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

৫. মূল্যায়ন (Assessment)

- কর্মসূচির প্রতিটি অংশের মধ্যে অন্তর্নির্মিত রয়েছে মূল্যায়ন; এর ফলে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন-সহায়ক হবে। সকল কাজের সেট শ্রেণীকরণ করা থাকবে এবং প্রতিটি সেটের ফরমেটিভ মূল্যায়নের জন্য লিখিত ফলাবর্তন দেওয়া থাকবে (যা শিক্ষার্থীর পেশাগত উন্নয়ন রেকর্ডে লেখা থাকবে)।
- প্রতিটি কোর্সের জন্য কমপক্ষে একটি চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন থাকবে। যে সব শিক্ষার্থী সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, উপলব্ধি ও দক্ষতা অর্জন করবে কেবলমাত্র তাদেরকেই যোগ্যতা অর্জনের সনদ প্রদান নিশ্চিত করার জন্য এ রকমটি করা হয়েছে। এ ধরণের মূল্যায়ন হয় টিচিং প্লেসমেন্টকালীন অথবা কোর্সের অংশ হিসেবে পরিচালিত হবে।
- কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলি (Programme Objectives) কোর্সের বিপরীতে চিত্রিত করা হবে এবং যে জ্ঞান সেটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখেই তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে মূল্যায়িত হবে। শিক্ষণবিজ্ঞানবিষয়ক কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের তাদের অধীত ও অর্জিত জ্ঞান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রায়োগিক অনুশীলনের সময় তা অনুচিন্তন করতে হবে।
- মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অবশ্যই ভারসাম্যময়, উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, সুপরিচালিত ও সুব্যবস্থিত হতে হবে। মূল্যায়ন অবশ্যই শিক্ষকের জ্ঞান, উপলব্ধি ও দক্ষতার প্রকৃত মূল্য নিরূপণের মাধ্যমে হতে হবে; সেটকৃত পাঠ মুখস্থকরণকে কোন দক্ষতা হিসেবে গণ্য করা হবে না। শিক্ষণ ও শিখনের উপর মূল্যায়নের প্রভাব সদর্থক হিসেবে গ্রহণ করা হবে।
- ডিপিএড কর্মসূচির সামগ্রিক মূল্যায়ন কৃতকার্য অথবা অকৃতকার্য এ দু'ভাবে করা হবে; সুতরাং পাশের কোন গ্রেড থাকার তেমন প্রয়োজন নেই। তবে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতার মাত্রার পার্থক্য নিরূপণের জন্য স্বতন্ত্র একটি গ্রেডিং পদ্ধতি রাখা যায়। তবে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে, শিক্ষার্থী যে গ্রেডেই পাশ করুক না কেন, তাকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ প্রাথমিক শিক্ষকের ভূমিকার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জন করতে হবে।

ডিপিএড কোর্সের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষার (Teacher Education) যে নতুন মডেলের রূপরেখা প্রস্তাব করা হচ্ছে তার বিষয়াবলি অধিকাংশই নতুন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে চলছে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত রূপরেখা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং এ জন্য সম্পদ সমাবেশ, স্টাফ নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের বিষয় ও পদ্ধতিতে অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন আনতে হবে। ডিপিএড-এর সার্থকতা আনয়নের জন্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন ও কোর্সসমূহ রচনা করার প্রয়োজন হবে।

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)

ডিপিএড কোর্সের কেন্দ্রীয় মূলমন্ত্র হচ্ছে একটি বিশ্বাস: শিক্ষকই হচ্ছেন শিক্ষণ-শিখনের মূল উপাদান আর শিক্ষার উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষকের উন্নয়নের উপর। এ সত্য যেমন পিটিআই-এর ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেলায়ও সত্য। ডিপিএড কোর্স সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিটিআই ইনস্টিটিউটগুলোর ইনস্ট্রাক্টরদের সংখ্যাবৃদ্ধিসহ তাদের গুণগত মান উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যদিকে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণের অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায়, পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান-অভিজ্ঞতাও সংযোজন করতে হবে।

বর্তমানে পিটিআই-তে ১২টি পূর্ণকালীন ইন্সট্রাক্টর পদ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু প্রায় সকল পিটিআই-এর অধিকাংশ পদই আবার শূন্য থাকে। অনেকগুলো বিশেষায়িত কোর্স পরিচালনা, সাংবাৎসরিক অনুশীলনী পাঠদান তত্ত্বাবধান করা এবং প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান অভিজ্ঞতা অর্জন

ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য পদগুলো পূরণের পরও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল বিবেচিত হবে। সুতরাং, প্রত্যেক পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর এবং অন্যান্য সহযোগী পেশাজীবী দল যারা ডিপিএড কোর্সে শিক্ষণ ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট তাদের জন্য উচ্চ মানসম্মত প্রশিক্ষণ সহজলভ্য করতে হবে। এই 'পেশাজীবী দলে' থাকবেন ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, পিটিআই ক্যাচমেন্ট এলাকার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষকবৃন্দ ও পিটিআই-কেন্দ্রিক ট্রেনিং স্কুলের নির্বাচিত শিক্ষকগণ।

এ প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য শিশুকেন্দ্রিক এবং সক্রিয় শিক্ষণ পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে পাঠপরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐ সকল এনজিও-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গঠন করা প্রয়োজন, যাদের ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে এ ধরনের কাজের উত্তম রেকর্ড রয়েছে। এ প্রস্তাবিত নীতি সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্ব গঠনে সরকারের গৃহীত নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরে বর্ণিত এমন একটি ব্যাপক ও সূক্ষ্ম প্রশিক্ষণ পরিচালনার মূল সঞ্চালকের দায়িত্ব যেহেতু নেপ পালন করবে, সেহেতু তাদেরকেও আরও দক্ষ ও যোগ্য সহযোগী অংশীদার হিসেবে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

উল্লিখিত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো:

- প্রাথমিক দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমানে পিটিআই-তে যে সব পদ শূন্য রয়েছে তা নির্বাচিত প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্য থেকে যোগ্যতা যাচাইসাপেক্ষে পূরণ করা;
- সময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুসরণে শিক্ষণ পদ্ধতি (পাঠদান প্রস্তুতি, উপকরণ চিহ্নিতকরণ, পরীক্ষা/প্রকল্প পরিচালনাসহ), তত্ত্বাবধান, ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, পঠন কর্মসূচি এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞতাসহ প্রতি পিটিআই-এর মান উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করা। নব প্রচলিত ডিপিএড কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে পরিচালনার জন্য পিটিআই-তে ১৬ জন পূর্ণকালীন ফ্যাকাল্টি-সদস্য থাকা প্রয়োজন;
- ডিপিএড পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পূর্বে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণ ডিপিএড-এর বিষয়বস্তু ও শিক্ষণবিজ্ঞান বিষয়ক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে ১২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। এ প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত হবে নেপ পরিচালিত একটা তাৎপর্যপূর্ণ সময়ব্যাপী প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে হাতে-কলমে পাঠদানের বাস্তব অনুশীলন অভিজ্ঞতা;
- ভবিষ্যতে সকল পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরকে শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে এবং এর সাথে একটা তাৎপর্যপূর্ণ সময়ব্যাপী প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে হাতে-কলমে পাঠদানের বাস্তব অনুশীলন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;
- প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যালয়ে অনুশীলনকালে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপার ও সহকারী সুপার কর্তৃক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করার জন্য ভ্রমণ ভাতা বরাদ্দ রাখা;
- ইনস্ট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থী অনুপাত ১: ১২.৫ অতিক্রম করবে না এবং শ্রেণি সাইজ ৩৪-এ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে;
- উচ্চ শিক্ষার্থী-সংযোগ ঘন্টা এবং দীর্ঘ কর্ম দিবস অনুচিন্তনমূলক, সুব্যবস্থিত ও প্রতি শিক্ষার্থী উন্নয়ন-কেন্দ্রিক শিক্ষণের জন্য সুসঙ্গত নয়। সুতরাং প্রতি শিক্ষা-বছর প্রতি পিটিআই-এ কেবলমাত্র এক পালার শিক্ষার্থী নিয়োজিত থাকতে পারে (দু-পালা বন্ধ করতে হবে);
- শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান চাহিদা বৃদ্ধির কারণে আরও অতিরিক্ত পিটিআই ও মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা দ্রুততর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন;
- বর্তমানে প্রচলিত সিইনএড কর্মসূচির প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের বৃত্তি প্রদান করা;
- ডিপিএড কোর্সের উচ্চতর স্তর বিবেচনায় পিটিআই-এর মর্যাদা পরিবর্তন করে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট করা প্রয়োজন।

শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষাসম্পদ সমাবেশ

ডিপিএড কোর্সটি সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে বাস্তবায়নের জন্য পিটিআই এবং পিটিআই সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়মূহকে যথাযথভাবে বস্তুসম্পদ ও মানবসম্পদ দ্বারা সজ্জিত করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণ যাতে অনলাইন উপকরণ স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন ও উত্তম শ্রেণীকক্ষে অনুশীলন অথবা যে বিষয় তারা পড়াবেন তা উপলব্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারেন, সে জন্য সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ তাদের নিকট সহজলভ্য করা অপরিহার্য। বিশেষজ্ঞ-শিক্ষণকক্ষসহ শিক্ষণ পরিচালনার জন্য নির্ধারিত সকল কক্ষ, গ্রন্থাগার ও ICT সুবিধা ও অন্যান্য সবকিছু সুযোগ-সুবিধা যথাযথভাবে সুসজ্জিত ও জনবলসমৃদ্ধ থাকতে হবে। এভাবে পিটিআই ও প্রশিক্ষণ স্কুলসমূহ ঘিরে একটি জীবন্ত, আনন্দদায়ক ও উত্তেজক মডেল

শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে। শিক্ষণ কাজ পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য পিপিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের কম্পিউটার ব্যবহারের প্রয়োজন হবে। প্রাত্যহিক কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করার ফলে তারা কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণও ICT ব্যবহারে আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে উঠবেন।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো:

- যে বিষয়গুলো প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের অনুশীলন করানো হয়, সে বিষয়ের উপযোগী করে সুংগঠিত ও ব্যবহার উপযোগী করে পিটিআই এর শ্রেণিকক্ষগুলো সজ্জিত করতে হবে (যথা: প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির বয়স-উপযোগী শিক্ষার্থীদের গণিত শিক্ষাদান অনুশীলনে যথাযথ বাস্তব উপকরণ সজ্জিত করা, বিজ্ঞান শিক্ষাদান অনুশীলনের জন্য ল্যাবরেটরি নয়-বরং শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান-বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অনুশীলনে যাতে প্রক্ষিণার্থী-শিক্ষকগণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে সে দিকে লক্ষ রেখে সযত্নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশ করা ইত্যাদি)। শ্রেণিকক্ষকে সক্রিয় ও আনন্দময় করার জন্য দৃশ্যমান ও অন্যান্য উপকরণাদির সরবরাহ যথাযথ ও যথেষ্ট হতে হবে।
- ইনস্ট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থী- শিক্ষক উভয়ের জন্য পিটিআই লাইব্রেরিকে সমসাময়িক পুস্তক, জার্নাল ও প্রাসঙ্গিক প্রকাশনা দ্বারা সজ্জিত করতে হবে।
- পেশাগত দিক থেকে পিটিআই গ্রন্থাগারিকসহ অন্যান্য স্টাফদেরকে দক্ষ ও দায়িত্বশীল হতে হবে। যখনই প্রয়োজন হবে, তখনই যেন গ্রন্থাগারের সমস্ত সুযোগ ও সুবিধাদি প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের সম্মুখে উন্মুক্ত করা যায়।
- পিটিআই লাইব্রেরিতে বা লিটারেসি রিসোর্স রুমে যথেষ্ট সংখ্যক শিশুদের জন্য সচিত্র বইপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের শিশুতোষ বই সংগ্রহ ও সংরক্ষিত রাখতে হবে।
- প্রতিটি ডিপিএড কোর্স-সংশ্লিষ্ট মূল পাঠ্যপুস্তক ও প্রাসঙ্গিক উপকরণাদি প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের জন্য পুনর্মুদ্রণ, বিতরণ ও সংরক্ষণ (বস্তুত কোর্স সহায়ক পঠনসামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হবে) করতে হবে।
- প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের ইংরেজি ভাষা কোর্স অনুশীলনের প্রয়োজনে স্বল্পব্যয়ী অডিও প্লেয়ারসহ অডিও উপকরণাদি সংগ্রহ ও তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।
- সকল পিটিআই-এর সকল ইনস্ট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষককের নিকট কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া এবং ইন্টারনেট সংযোগসহ ICT যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করতে হবে। প্রত্যেকটি পাঠদান কক্ষে একটি ডাটা প্রজেক্টরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রত্যেক ইনস্ট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক যাতে ইন্টারনেট ও সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারেন সে জন্য ICT -এর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি পিটিআই -এ একটি টেকনিসিয়ানের পদ সৃষ্টি করতে হবে।
- পিটিআই-এ অবস্থান কালে ৪ জন প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকের জন্য ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১টি ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং প্রত্যেক ইনস্ট্রাক্টরের জন্য ১টি ল্যাপটপ কম্পিউটার থাকবে।
- প্রথম ৩ টার্ম সময়-পরিসরে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণকালে

(School Placement) প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের কাজে গতি আনয়ন ও যাতায়াতে সহায়তা করার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ ১০-১২ সিটের একটি মাইক্রোবাসের সংস্থান রাখতে হবে।

- বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে উপর্যুক্ত ICT - সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকের জন্য ১টি স্বল্পব্যয়ী ল্যাপটপ কম্পিউটার ইস্যু করা যায় ('একজন শিশু একটি ল্যাপটপ' নীতিমালার অনুসরণে)। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষককে যে বিদ্যালয়ে প্রথম পদায়ন করা হবে ল্যাপটপ সে বিদ্যালয়ের সম্পদে পরিণত হবে। স্বল্প মেয়াদি এ ক্রয় স্বল্পব্যয়ী হবে কারণ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়টি ICT সুবিধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট খাতে বাৎসরিক ব্যয়ের সঙ্গে ল্যাপটপ ব্যয় সমন্বিত করা যাবে।
- পিটিআই-এ স্থায়ীভাবে স্থাপিত কম্পিউটারটি নেটওয়ার্কযুক্ত হবে এবং ক্যাম্পাসের অন্তত একটি অংশে বেতার (wireless access) সুযোগ থাকবে।

পিটিআই সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় (Training School)

ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণ পিটিআই সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে কীভাবে বিদ্যালয়ে পাঠ পরিচালনা করতে হয় তার বাস্তব শিক্ষা লাভ করবেন। প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে তারা শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, শিক্ষণ-শিখনে কার্যকর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অনুশীলন করতে পারবেন এবং এভাবে তারা বাস্তব পরিস্থিতিতে স্বীয় শিক্ষণ যোগ্যতার উন্নয়ন করতে পারবেন।

প্রস্তাবিত অনুশীলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো:

- পিটিআই ক্যাচমেন্ট এলাকার মধ্যে প্রত্যহ যাতায়াতযোগ্য দূরত্বে ২০-৪০ টি মডেল স্কুল (বিদ্যমান স্কুল ব্যতীত) প্রতিষ্ঠা করা,
- এসব মডেল স্কুলে যদি কোন প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক থাকেন তাহলে তাকে ডিপিএড কোর্সের প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা,
- এ সব স্কুলের সকল শিক্ষককে মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কোর্সের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে (এরকম প্রশিক্ষণ মডেল সরকার পরিচালিত BEHTRWC প্রকল্পে বিদ্যমান রয়েছে)।
- এ সব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও একই ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ হবে এবং কীভাবে নিজের স্কুলের অভ্যন্তরে ডিপিএড শিক্ষার্থীসহ ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।
- বিশেষায়িত এক বা একাধিক প্রি-প্রাইমারি শ্রেণিকক্ষসহ মডেল স্কুলসমূহ বিশেষভাবে উপকরণ ও সম্পদ সজ্জিত করে (যেমন: বিষয়ভিত্তিক উপকরণ, সক্রিয় পাঠদান উপকরণ বেদী, প্রদর্শনযোগ্য উপকরণ এবং ICT- ভিত্তিক উপকরণ সজ্জিত) প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদেরকে ডিপিএড নীতিমালা অনুসারে শিক্ষণে সক্ষম করে তুলতে হবে।
- এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদেরকে বিজ্ঞ পরামর্শ দান ও দৃষ্টান্তমূলক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে ইনস্ট্রাক্টরগণ যেন যথেষ্ট সময় পান তার ব্যবস্থা রাখা এবং এ লক্ষ্যে সকল মডেল স্কুলকে এক পালার স্কুলে রূপান্তরিত করা আবশ্যক।

টার্ম-২ এবং টার্ম-৩ বিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণকালে(School Placement) প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণ যাতে পূর্ণকালীন শিক্ষণ-দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হন, সে জন্য প্রতি পিটিআই এলাকায় ৪০ টি মডেল স্কুলের সহায়তার প্রয়োজন হবে। এ স্বল্প সময়ে এ বিপুল সংখ্যক মডেল স্কুল উপকরণ সজ্জিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা বাস্তবসম্মত না হতে পারে, সে জন্য মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্রতি পিটিআইকে কেন্দ্র করে ২০ টি মডেল স্কুল প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় হিসেবে প্রস্তুত করা যেতে পারে।

যাইহোক, এ সংখ্যা যত শীঘ্র সম্ভব ৪০ টি তে উন্নীত করা একটি অতি জরুরি এবং অপরিহার্য কাজ।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর (নেপ) ভূমিকা

ডিপিএড কোর্সসহ শিক্ষক-শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা নেপের দায়িত্ব। কোর্সের শিখনফল নিবিড় পরিবীক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে নেপ এ দায়িত্ব পালন করবে। নেপ সকল প্রকারের মূল্যায়ন ও ডিপিএড ডিপ্লোমা প্রদান বিষয়ে দৃষ্টি রাখবে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নেপের উপর নতুন দায় বর্তাবে ফলে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য তার প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো:

- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ জনবল সমন্বয়ে নেপের অভ্যন্তরে 'একটি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড' গঠন করা বাঞ্ছনীয়। ডিপ্লোমা প্রদানসহ ডিপিএড কোর্স অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন শিক্ষণ, শিখন ও মূল্যায়নের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এ সংস্থার সরাসরি দায়িত্বে থাকবে।
- পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সক্ষম করে তোলার

জন্য ডিপিএড কোর্সের বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে নেপের সকল ফ্যাকাল্টি সদস্যদের ৬ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পরামর্শকগণ ও উপকরণ উন্নয়ন দলের সদস্যদের সহযোগিতায় প্রণীত উপকরণের উপর অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণটি সংশ্লিষ্ট উপকরণ উন্নয়ন গ্রুপ নেতা ও টিম নেতার দ্বারা পরিচালিত হবে।

- নেপ ডিপিএড কোর্সের বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর/মাস্টার ট্রেনার্স এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের ১২ সপ্তাহের একটি বিস্তৃত প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব প্রদান করবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এনজিও সংস্থাসমূহের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের ৬-৮ সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। এ প্রশিক্ষণ ইউআরসি-তে অনুষ্ঠিত হবে।
- নেপ ডিপিএড কোর্সের অব্যাহত উন্নয়নের জন্য পিটিআই-তে বাস্তবায়িত ডিপিএড কোর্সের উপর গবেষণা পরিচালনা করবে। এ জন্য নেপ তার ফ্যাকাল্টি সদস্যদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার গবেষণা-সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে।
- ডিপিএড কর্মসূচির গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য নেপ একটি নিয়মিত ও কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং তার জনবলের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে।
- নেপের বর্তমান জনবল কাঠামো ডিপিএড কর্মসূচি তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়। এ জন্য বিদ্যমান ফ্যাকাল্টি পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তা অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বর্তমানে নেপে কর্মরত ফ্যাকাল্টি সদস্যগণের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণীকক্ষভিত্তিক শিক্ষণের অভিজ্ঞতা নেই। নেপে কর্মরত ফ্যাকাল্টি সদস্যদের এ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং নতুন ও শূন্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যাদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা রয়েছে কেবলমাত্র তাদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

নেপের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ (Resources)

প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োজিত নেপের ইনস্ট্রাক্টর ও স্টাফদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানসমৃদ্ধ পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রন্থাগার ও আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ অবারিত রাখতে হবে।

এ জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো:

- প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ-উপকরণ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নেপের ইনস্ট্রাক্টর ও স্টাফদের যে তথ্যসম্পদের প্রয়োজন হবে তার জন্য নেপের গ্রন্থাগার ও আইসিটি ব্যবহারের উত্তম সুযোগ রাখতে হবে।
- বিশ্বব্যাপী উচ্চমানের শিক্ষক-শিক্ষা সম্পর্কিত যে সব গবেষণা ও প্রাসঙ্গিক প্রকাশনা রয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষক উন্নয়নের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে, এমন দেশের সে সব গবেষণাকর্ম ও তথ্যভান্ডার নেপের ফ্যাকাল্টি সদস্য ও স্টাফদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে অংশীদারিত্ব: বাংলাদেশ সরকার নীতিগতভাবে স্বীকার করেছে যে, সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাবিদগণকে একটি সাধারণ লক্ষ্যে এক সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের কিছু এনজিও স্কুলে সক্রিয় শ্রেণীকক্ষ সৃষ্টির বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে, ডিপিএড কোর্স বাস্তবায়নে নেপ ও অন্যান্য সংস্থার পারস্পরিক তাৎপর্যপূর্ণ সহযোগিতা ও সুবিধা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ সরকার নীতিগতভাবে স্বীকার করেছে যে, সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাবিদগণকে একটি সাধারণ লক্ষ্যে এক সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের কিছু এনজিও স্কুলে সক্রিয় শ্রেণীকক্ষ সৃষ্টির বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে, ডিপিএড কোর্স বাস্তবায়নে নেপ ও অন্যান্য সংস্থার পারস্পরিক তাৎপর্যপূর্ণ সহযোগিতা ও সুবিধা গ্রহণ করা হবে।

অংশীদারিত্বের সুবিধা নিম্নরূপ:

- পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রশিক্ষণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকগণকে 'শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় শিখন' অভিজ্ঞতা লাভে সহযোগিতা প্রদান করবেন, এর ফলে তারা শিশুবিকাশের তত্ত্ব ও শিখন এবং কার্যকর শিক্ষণ ও শিখনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবেন (যেমন: শিখন, শিক্ষণ, মূল্যায়ন কৌশল এবং শ্রেণিকক্ষের

ভাষা ইত্যাদির সমীকরণে একটি কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন)।

- নির্বাচিত সরকারি ও রেজিস্টার্ড স্কুলের গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষকে ডিপিএড নীতিমালার প্রয়োজনে প্রত্যাশিত 'সক্রিয় শ্রেণিকক্ষে' পরিণত করে এ সব স্কুলের সামর্থ্য বৃদ্ধি করবেন। অতঃপর এ সব স্কুলগুলোকে পিটিআই ট্রেনিং স্কুল হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

- ডিপিএড-কে ভিত্তি করে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের জন্য ৩ মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হবে। পিটিআই-এ প্রচলিত শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের সাথে পিটিআই ক্যাচমেন্ট এলাকায় নতুনভাবে রূপান্তরিত প্রশিক্ষণ স্কুলে সক্রিয় শিখনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রশিক্ষণ কোর্সটি রচনা করা হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিম্নোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে যোগ্য সংস্থা নির্বাচন করা হবে।

- শিক্ষাক্রম এবং উপকরণ উন্নয়ন, শিক্ষক-শিক্ষা এবং শিক্ষক উন্নয়ন, সক্রিয় শিক্ষণ ও শিখনে শ্রেণিকক্ষ সংগঠন এবং শ্রেণিব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধান, শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতা পরিবীক্ষণ এবং সমাজের অংশগ্রহণসহ প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনার ব্যাপক ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা (কমপক্ষে ৫ বৎসর) থাকতে হবে।

- পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি পরিচালনায় একটি মডেল উন্নয়ন করেছে এবং সারা দেশব্যাপী এ মডেলের স্কুলের তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা সম্প্রসারণের প্রামাণিত ব্যবস্থা রয়েছে এমন সংস্থা হতে হবে।

- শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতা, ভর্তি, সমতা এবং একীভবন, অনুপস্থিতি, ঝরে পড়া এবং পুনরাবৃত্তি এবং দেশ ও দেশের বাইরের ব্যয় বিবরণীসহ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে।

- বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের (School Placement) সময় প্রত্যেক ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীর জন্য সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব (International Partnership)

একটি প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নেপ তার সক্ষমতা উন্নয়নে সমমানের কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন কতিপয় দেশের (যেমন: ভারত ও শ্রীলঙ্কা) উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে ডিপিএড কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে।

পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন পর্যায় (Piloting Phase)

সকল প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ শেষে এবং প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ তৈরির পর ৭টি পিটিআই-তে ডিপিএড পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। এ সময় প্রতিটি পিটিআই কেন্দ্র করে অনুশীলনের জন্য ২০টি' প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়' নির্বাচন করা হয়। এ স্কুলগুলোতে ডিপিএড শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়কেন্দ্রিক অনুশীলন পরিচালিত হচ্ছে এবং কীভাবে তারা এ কোর্সে অংশগ্রহণ করছে, তা পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন, শিক্ষককে সহায়তা দান, প্রদর্শনী পাঠদান, মাঠ-পর্যায় থেকে কীভাবে তারা শিক্ষা লাভ করছে ইত্যাদি কার্যক্রম পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ স্কুলকে 'মডেল' বা 'এক্সপেরিমেন্টাল' স্কুল বলা হচ্ছে না বরং বিশ্বব্যাপী এ ধরনের স্কুলকে পেশাগত উন্নয়ন বিদ্যালয় বা Professional Development School (PDS) বলা হয়, এ স্কুলগুলো তাই। এ সব বিদ্যালয় পিটিআই-এর নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীরা নিজের চোখে দেখতে পায় বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে প্রকৃতপক্ষে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

'স্কুল অব এক্সেলেন্স' নয়, বস্তুত সমগ্র ডিপিএড কোর্স মডেলে এবং পরবর্তীকালে সিপিডি সেকশনে দেখা যাবে কীভাবে ক্রমাগত নিজেদের কার্যক্রম অব্যাহত বিবর্তনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ স্কুলগুলো 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' হয়ে উঠবে। পাবলিক সেক্টরে খুব কম সংখ্যক' এক্সেলেন্ট' স্কুলের অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং বিদ্যমান স্কুলগুলোকে উৎকৃষ্টতম স্কুলে উন্নীত হতে হলে গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হবে। এভাবে পিটিআই ও তার ইনস্ট্রাক্টরগণ পিটিআই-কে ক্রমাগতভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে' পিটিআই অব এক্সেলেন্স'-এ পরিণত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

--ড. একেএম খায়রুল আলম

অধ্যাপক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ

তপন কুমার দাশ

সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন : আশু করণীয়

এবারে সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিবেচনা করেই 'সাসটেইনেবল' বা টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আলোচনা করার এই প্রয়াস। বস্তুত বর্তমান সমাজের অভাবিত এবং ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা এবং বিশ্বকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যেই সাসটেইনেবিলিটি বা টেকসই বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের ভাবনাটি সমাজে প্রচলিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এই স্বর্ণযুগে মানুষ যাতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্থিতাবস্থাকে বিনষ্ট করে না ফেলে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারে একটি সুন্দর ও কল্যাণকর বিধিব্যবস্থাসম্পন্ন সম্পদশালী পৃথিবী তার জন্যই অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে গৃহীত হয়েছে টেকসই উন্নয়নের প্রসঙ্গ। প্রথম দিকে টেকসই উন্নয়নের আলোচনা প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়িত্বশীলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এ প্রসঙ্গটির পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এখন সাসটেইনবিলিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় পরিণত হয়েছে।

A sustainable society is a society

- That meets the needs of the present generation,
- That does not compromise with the ability of future generations to meet their own needs
- In which each human being has the opportunity to develop itself in freedom, within a well-balanced society and in harmony with its surroundings.

(তথ্য সূত্র: http://www.ssfindex.com/sustainability/notes-and-definitions/)

একইভাবে আদিকাল থেকে মানুষের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার গুরুত্ব, পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়েছে। মূলত সমাজে বিদ্যমান পরিবর্তন কিংবা অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারার লক্ষ্যে মানুষ কখনো পরিকল্পিতভাবে আবার কখনো অজান্তেই এ পরিবর্তন সাধন করেছে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও এ পরিবর্তন দৃশ্যমান কিংবা অনুভবযোগ্য। তবে সাক্ষরতার অনস্বীকার্যতা নিয়ে কোন মতান্তর নেই। যদিও কোন কোন সমাজ মনে করে সাক্ষরতার লিখিত রূপ থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই।

সে যাই হোক, মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে, সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে সাক্ষরতার ভূমিকার কথা সেই আদিকাল থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের গবেষক, শিক্ষাবিদ সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। তাঁরা প্রায় সকলেই বলেছেন, সাক্ষরতা মানুষকে সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা প্রদান করে। এতে করে মানুষের জীবনে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হওয়া সহজতর হয় এবং মানুষ নিজ নিজ উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সমাজ এবং দেশ গড়ার অন্যতম উপায় হিসেবে বিশ্বব্যাপী সাক্ষরতা কর্মসূচির কার্যকর প্রয়োগ ব্যাপকভাবে শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই। চীন, রাশিয়া, কিউবাসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নতুন সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে সাক্ষরতার প্রসার ঘটাতে থাকে। এমন কি ষাট সত্তরের দশকে আলজেরিয়া, ইক্যুয়েডর, ইরান, মালি, শ্রীলঙ্কা, ভারতের কেরালা রাজ্য ব্যাপক সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করে সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে।

কিউবায় ১৯৬১ সালে পরিচালিত সাক্ষরতা অভিযান বহুল আলোচিত সাক্ষরতা অভিযানগুলোর অন্যতম। নয় মাসব্যাপী এ অভিযানে ৯৫,০০০ নিবেদিত যুবক/যুবতী স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক হিসাবে কাজ করে। এদের অনেকেই শিক্ষাদানের জন্য শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যায়। কিউবায় সাক্ষরতা অভিযান এমন এক সময় পরিচালিত হয়েছে যখন বিপ্লবের উত্তাপ সমগ্র সমাজকে একত্রিত করেছে। ১৯৬১ সালের ২২ ডিসেম্বর ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিউবাকে 'নিরক্ষরমুক্ত অঞ্চল' হিসাবে ঘোষণা করেন (জেনিংস ২০০০)।

এই সময়কালেই ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি সাক্ষরতার ক্ষেত্রে "মনোসামাজিক পদ্ধতি" শীর্ষক নতুন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং ব্রাজিল ও চিলিতে এ পদ্ধতি ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। এ পদ্ধতিতে তিনি সাক্ষরতাকে কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞান-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবন ও সমাজসমস্যা বিষয়ে মুখর করার সংস্কৃতি চালু করেন। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজ নিজ সমস্যা চিহ্নিত করে নিজেরাই সংগঠিতভাবে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতে পারেন তাই ছিল

তাঁর উদ্ভাবনী সাক্ষরতা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য।

বলা বাহুল্য, সাক্ষরতা স্থবির কোন কর্মসূচি নয়, এটা পরিবর্তনশীল। সব সময়েই এ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ইউনেস্কো, ইউএনডিপি-সহ বিশ্বব্যাপী কর্মরত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত সংগঠনগুলো সমাজ জীবনের বহুধাবিভক্ত প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে এ পরিবর্তন সাধনে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

সাক্ষরতা'র সংজ্ঞায় কিংবা সাক্ষরতাকে অর্থবহ করার জন্য এ সকল পরিবর্তন সাধনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে ইউনেস্কো। তাছাড়াও বিশ্বব্যাপী কর্মরত নানা প্রতিষ্ঠান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সাক্ষরতার পরিধিকে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন,

- সাক্ষরতা অর্জনের দক্ষতাকে তারা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কৌশলসমূহ আয়ত্তের দক্ষতা হিসাবে না দেখে সামাজিকীকরণের একটা প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেন। (স্ট্রীট ১৯৮৪)
- শুধুমাত্র কিছুটা লেখাপড়া শেখাই শেষ কথা নয়, মানুষকে তার সামাজিক, নাগরিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উপায় হিসাবে সাক্ষরতাকে গণ্য করতে হবে। যা সরাসরি জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহার করা যেতে পারে। (১৯৬৫ সালের তেহরান সাক্ষরতা সম্মেলন)
- যখন কোন ব্যক্তি সমাজ ও সম্প্রদায় কার্যকার ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষরতার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন, তখন তাকে ব্যবহারিক দিক থেকে সাক্ষরতা বলা যায়। (ইউনেস্কো ১৯৬২)
- উচ্চ মাত্রার দক্ষতাসমূহ অর্থাৎ শুধুমাত্র পড়তে ও লিখতে জানা থেকে শুরু করে সমাজ ও পরিবারে কার্যকর ভূমিকা চিহ্নিত করার মানসে 'ব্যবহারিক সাক্ষরতা' এবং 'ব্যবহারিক নিরক্ষরতা' ধারণা দু'টির অবতারণা করা হয়েছে। (ওইসিডি ১৯৯২)।

এ ছাড়াও, নিকারোগুয়া, কিউবা বিংবা তানজানিয়ার মত দেশগুলোতেও ব্যপক সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রাক্কালে সাক্ষরতা সংজ্ঞাকে নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারেই অভিযোজন করা হয়। বলা বাহুল্য, অনেক দেশেই ইতিপূর্বে তা করা হয়েছে। আর সব কিছুই সম্পাদিত হয়েছে স্বাক্ষরতার ফলে উদ্ভূত পরিবর্তন সমুহকে স্থায়ীত্বশীল করার জন্যই।

উপর্যুক্ত পরিবর্তনসমূহকে ধারণ করেই '৭০ এর দশকে সাক্ষরতার পরিবর্ধিত কর্মসূচি হিসেবে জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও ১৯৫৬ সালেই জার্মানীতে সর্বপ্রথম Life Long Learning-এর ধারণা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সত্তরের দশকের শুরুতে ইউনেস্কো কর্তৃক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করা হয়। এ কমিশনের সভাপতি ছিলেন ফরাসি দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এডগার ফ'রে। কমিশন ১৯৭২ সালে প্রতিবেদন তৈরির কাজ শেষ করে এবং এ প্রতিবেদনটির নাম দেওয়া হয়েছিল Learning to be : The World of Education, Today and Tomorrow। এ কমিশন চারটি বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়। প্রথমত, আজকের দিনের আন্তর্জাতিক সমাজ, দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে বিশ্বাস, তৃতীয়ত, সকল উন্নয়নের লক্ষ্য হলো মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খুলে দেওয়া আর চতুর্থত, পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য চাই জীবনভর শিক্ষা অর্থাৎ অব্যাহত শিক্ষা। এভাবেই মূলত অব্যাহত শিক্ষার ধারণাটি কাঠামোগত রূপ লাভ করতে শুরু করে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষ জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষার মান ও জীবন-ধারণ পদ্ধতির উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। যত বেশি সংখ্যক মানুষ জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে, তত বেশি মানুষ সমাজে সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে।

বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা কর্মসূচির পরবর্তী পরিচর্যা বা ধাপ হিসেবে অব্যাহত শিক্ষা'র মোড়কে জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে সেই ১৯৭২ সালের পর থেকেই। তবে অন্যান্য কর্মসূচির তুলনায় জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি খুবই কম। ১৯৯০-এর দশকে এ ধারণা কিছুটা পরিশীলিত রূপ লাভ করে এবং "সাক্ষর সমাজ" প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সরকারিভাবেও বেশ কিছু কর্মোদ্যোগ গৃহীত হয়। তবে এ সব উদ্যোগের কোনটিই স্থায়ী রূপ লাভ করেনি।

উন্নয়নশীল বিশ্বের নানা দেশেই একই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সালের ডাকার সম্মেলনে জীবনব্যাপী শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়। (ক) মৌলিক শিক্ষার ব্যাপকতর ধারণার গুরুত্ব উপলব্ধি এবং জীবনব্যাপী শিখনের পরিবেশ ও সুযোগের মধ্যে সাক্ষরতার ব্যবহার ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগকে একীভূত করা প্রয়োজন এবং (খ) বহুমাত্রাযুক্ত ও পারিপার্শ্বিকতাকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ স্বীকার করে নিয়ে ২০১৫ সালের জন্য বয়স্ক সাক্ষরতার অপেক্ষাকৃত সুসংহত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

২০১৫ সালের সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক কোরিয়া ঘোষণায়ও (প্রস্তাবিত) জীবনব্যাপী শিক্ষার নয়া-ভিশনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষাঅভিমুখী সমাজ গঠনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মূলত স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে ঘটে

যাওয়া যুগান্তকারী পরিবর্তনসমূহ, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম একটি সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম উপায় হিসেবেই সমগ্র মানব জাতিকে জীবনভর শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকার মত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত তৈরি করাই হচ্ছে ২০১৫ সালের সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

মৌলিক শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে সাক্ষরতার সাথে জীবনব্যাপী শিখনের ধারণা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অতীতের চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক এবং এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'লিটারেসি এন্ড সাসটেইনেবল সোসাইটি' বাংলাদেশের জন্য অনেক বেশি প্রযোজ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে একদিকে যেমন বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য, ঠিক তেমনি দেশ-বিদেশের শ্রম বাজার, তথ্যভিত্তিক সমাজ গঠন, পরিবেশ দূষণ রোধ, একীভূত ও ঐকমত্যের সমাজ গঠন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় সকল মানুষকে জীবনব্যাপী শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা জরুরি। এজন্য কোন ধরনের 'এড-হক' ব্যবস্থা বা প্রকল্পভিত্তিক ব্যবস্থা কার্যকর হবে না, প্রয়োজন স্থায়ী ও কাঠামোধীন ব্যবস্থা।

অবশ্য, বেসরকারি শিক্ষা ও উন্নয়ন সংগঠনগুলো ইতোমধ্যেই জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আহছানিয়া মিশন, এফআইভিডিবি ও ব্র্যাক এ বিষয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। ইউনেস্কো-ঢাকা এক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা ছাড়াও এনএফই ডেলিভারী ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে। যার মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে জীবনব্যাপী শিখন কার্যক্রম পরিচালনার দিক-নির্দেশনাও রয়েছে।

গণসাক্ষরতা অভিযানও ২০০৭ সালে ইউনেস্কো এবং এসিসিইউ-জাপান কর্তৃক আয়োজিত জীবনব্যাপী শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দিক-নির্দেশনা অনুসারে পাইলট কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক জনঅংশগ্রহণে অব্যাহত শিক্ষা তথা জীবনব্যাপী শিক্ষার কাঠামো উন্নয়ন করেছে ঃ

প্রস্তাবিত মডেল

অব্যাহত শিক্ষা কর্ম-গবেষণার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কার্যকর অংশগ্রহণে স্থায়িত্বশীল অব্যাহত শিক্ষার একটি মডেল তৈরি করা হয়েছে, যা বিদ্যমান অব্যাহত শিক্ষা মডেল-এর পাশাপাশি সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য।

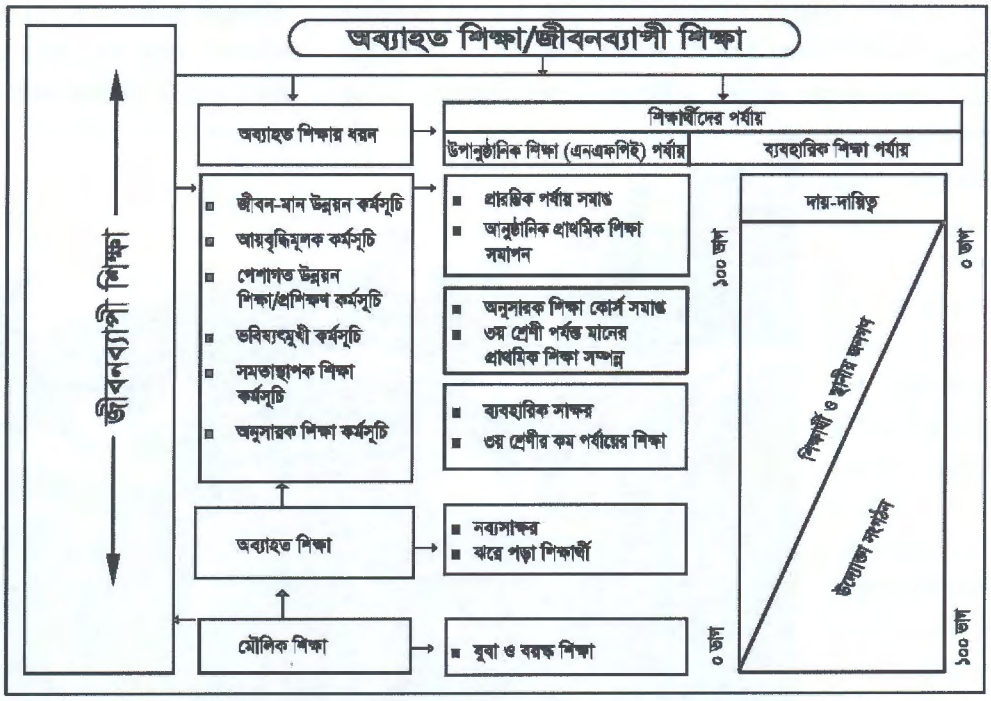

সূত্র : জনঅংশগ্রহণে অব্যাহত শিক্ষা : কর্ম অভিজ্ঞতা, পৃষ্ঠা-২৪

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষ জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষার মান ও জীবন-ধারণ পদ্ধতির উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। যত বেশি সংখ্যক মানুষ জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে, তত বেশি মানুষ সমাজের সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে। ২০২১ সালের উন্নয়ন রূপকল্পে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানুষের চাওয়া-পাওয়া এবং তাদের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার যৌক্তিক উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটলে সত্যিকার টেকসই উন্নয়নের সূচনা ঘটবে বলে আশা করা যায়।

তপন কুমার দাশ
উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

(আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৫ উপলক্ষে প্রকাশিত অঙ্গীকার শীর্ষক স্মরণিকা থেকে গৃহীত।)

জাকির আহমদ খান কামাল

ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস ও আমাদের প্রত্যাশা

আইয়ুবী সামরিক শাসন বিরোধী, শিক্ষার অধিকার ও ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ দিনটি "শিক্ষা দিবস" হিসেবে পালিত হয়। গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটিকে পালন করে থাকে। অধিকার হরণকারী গণবিরোধী তথাকথিত জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করণসহ আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সহজলভ্য, গণমুখী একটি শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠার দাবীতে ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দিতে সেদিন পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফাসহ অনেকে। আহতও হয়েছিলেন অর্ধশত। শত শত ছাত্রকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। সামরিক বাহিনীর অমানুষিক নির্যাতনের পরও আন্দোলন আরো বেগবান হতে থাকে এবং তা ভিন্ন মাত্রায় রূপ নেয়।

অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে "অবাস্তব কল্পনা" আখ্যায়িত করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজী পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষা হিসাবে গ্রহণ, জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের অপচেষ্টা, আরবির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা এবং রোমান বর্ণমালার সাহায্যে পাকিস্তানী ভাষা সমূহকে অরান্তরের অপচেষ্ঠায় লিপ্ত হয়ে ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানী আমলা এম শরীফের নেতৃত্বে একটি "জাতীয় শিক্ষা কমিশন" গঠন করা হয়। এর আগে ১৯৫৮ সালে জনগণের সকল ধরনের মৌলিক অধিকার হরণ করে জঘন্য ও অত্যাচারী সামরিক শাসন কায়েম করা হয়। সমগ্র দেশের ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করে গণবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি। জনগণের স্বার্থ, কল্যাণ এবং বিজ্ঞানমনস্ক অসাম্প্রদায়িক গণমুখী একটি শিক্ষানীতির দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে সামরিক শাসক আইয়ুব খান পিছু হটতে বাধ্য হন এবং বাতিল করেন জাতীয় শিক্ষানীতি।

কিন্তু ধূর্ত আইয়ূব খান নতুন মোড়কে ও ভিন্ন অপকৌশলে ১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন গঠণ করে শরীফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতিই বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে এ কমিশনের নাম দেওয়া হয় "ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ কমিশন।" ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বহু প্রচেষ্টা ও কৌশল করেও প্রবল ছাত্র আন্দোলনের মুখে হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্টও বাস্তবায়ন করতে সরকার সক্ষম হয়নি। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ১১ দফার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিণতিতে ২৪ জানুয়ারী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে

পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয় তাকে বাঁধাগ্রস্ত করতে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান পুনরায় সামরিক শাসন জারী করেন এবং এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পুনরায় শিক্ষানীতি প্রনয়ণ করে এ জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়।

ষাটের দশকের ছাত্র সমাজের গৌরবময় ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত আন্দোলনের ফলে গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শিক্ষার অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামে ছাত্র সমাজ গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার মূলধারায় সম্পৃক্ত করে ৬ দাফা, ১১ দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং তারই ধারাবাহিকতায় বহু লড়াই-সংগ্রাম, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় এবং সবচেয়ে বড় বিজয় ও অর্জন স্বাধীন বাংলাদেশ। এই দীর্ঘপথ পরিক্রমায় অসংখ্য শহীদ তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, নেতাকর্মী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, দীর্ঘ কারাভোগ ও হয়রানির মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছেন, মামলা ও হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপন করে সংগঠন ও আন্দোলন সংগঠিত করেছেন জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় উৎসর্গ করে দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ত্যাগ স্বীকার করে শিক্ষাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন তাদের সবাইকে মহান শিক্ষা দিবসে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি এবং শহীদদের রুহের শান্তি কামনা করছি।

১৯৬২ মালের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকেই ছাত্র আন্দোলন ও সংগ্রামে নিজেকে জড়িয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন তিনি হলেন আমাদের আজকের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ। তাঁরই সার্বক্ষণিক কর্মপ্রয়াস ও পরিচালনায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ইতোমধ্যে আমাদের হাতে, যা সর্বমহলেই প্রশংসিত হয়েছে। তবে বহুমুখী সীমাবদ্ধতা, সমস্যা ও বাধার মধ্যে শম্বুক গতিতে এগুচ্ছে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন। হতাশার বিষয় হল, আজকের ছাত্রসমাজ সেই অতীতের ধারা থেকে সরে এসেছে। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির ফলে ছাত্র সমাজ তাদের নিজস্ব নৈতিক অধিকার সম্পর্কে অচেতন থেকে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানি, মারামারি ও সংঘাত করে প্রতিনিয়ত জানিয়ে দিচ্ছে ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাস থেকে তারা যথাযথ শিক্ষা নিতে পারছে না। এর দায় শুধু ছাত্র সমাজেরই নয়। আমরা যারা ছাত্র সমাজের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত, সকলেই যদি প্রত্যেকের অবস্থান থেকে যথাযথভাবে ওদেরকে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে চালিত করি, তবেই হয়ত ওরা মূলধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হবে। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে এমনটিই আমার প্রত্যাশা সকলের কাছে। পাশাপাশি শিক্ষা পরিকল্পনাবিদসহ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীত আহবান থাকবে অনতিবিলম্বে শিক্ষানীতি প্রতিশ্রুত প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সুযোগ- সুবিধাসহ স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের আওতায় নিয়ে আসবেন। আমরা আমাদের শহীদদের আত্মদান এবং অতীতের সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে দ্রুততার সাথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব।

জাকির আহমদ খান কামাল
শিক্ষক ও কলাম লেখক

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

Literacy and Sustainable Societies

সাক্ষরতা আর দক্ষতা টেকসই সমাজের মূলকথা

New technologies, including mobile telephones, also offer fresh opportunities for literacy for all. We must invest more, and I appeal to all Members States and all our partners to redouble our efforts - political and financial - to ensure that literacy is fully recognized as one of the most powerful accelerators of sustainable development. The future starts with the alphabet.

UNESCO Director-General

শিক্ষার আবশ্যিক শর্ত সাক্ষরতা অর্জনে জাতিসংঘ এবং ইউনেস্কোর বিশেষ অনুপ্রেরণায় প্রতি বছর উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং নিরক্ষরমুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘ এবং ইউনেস্কোর সদস্য হিসেবে সকল উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। এ বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশসহ জাতিসংঘভুক্ত সকল দেশ এ বিষয়ে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রতি বছরের মতো এবারও গণসাক্ষরতা অভিযান বহু বেসরকারি সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটি গ্রুপের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস- ২০১৫ উদযাপন করে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'Literacy and Sustainable Societies', যার বাংলা ভাষান্তর করা হয়েছে "সাক্ষরতা আর দক্ষতা টেকসই সমাজের মূলকথা"। শিক্ষা মানুষের জীবনধারার কার্যপ্রক্রিয়ার একটা অংশ, জীবন যুদ্ধের একটি অদ্বিতীয় হাতিয়ার। এমনকি জীবনের সার্বিক অগ্রগতির নির্দেশক আর সাক্ষরতা শিক্ষার প্রাথমিক সোপান। প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক যে কোন শিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

২০১৫ হলো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের ৫০ বছর পূর্তির বছর। এছাড়া 'সবার জন্য শিক্ষা' এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজিস্)' এর লক্ষ্য পূরণের বছরও এই ২০১৫।

ইতোমধ্যে আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া সরকারী হিসেব মতে প্রায় শতভাগ শিশু এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, এ ছাড়াও আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও অনেক অর্জন থাকা সত্ত্বেও 'সবার জন্য শিক্ষা'র বয়স্ক সাক্ষরতা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা এখনও পিছিয়ে আছি। এখনও সারতার বাইরে রয়েছে সুবিধাবঞ্চিত অনেক বয়স্ক ব্যক্তি, কিশোর-কিশোরী ও শিশু যার মধ্যে বেশির ভাগ হলো নারী। তাই নিউইয়র্কে গত সেপ্টেম্বরের ২৫-২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনের-নামে মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে Sustainable Development Goals-এর যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয় তার মধ্যে ৪নং শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্যে বলা হয়েছে Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all, যেখানে সবার জন্য সাক্ষরতা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ৪নং গোল-এ সাক্ষরতা বিষয়ে টার্গেট ৪.৬ বলা হয়েছে By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy .

সাক্ষরতাই জীবনব্যাপী শিক্ষার মূল যা মানুষের টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি। সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় । বিগত দুই দশক ধরেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই টেকসই উন্নয়নের উপর গুরুত্ব

দেয়া হচ্ছে। তাই সকল ধরনের উন্নয়ন আলোচনাতেই টেকসই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। পৃথিবীর অনেক দেশই টেকসই উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী সাক্ষরতা ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষাকে ঢেলে সাজিয়েছে। বাংলাদেশও এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া এখনই প্রয়োজন। কারণ, বাংলাদেশে এখনও সব বয়সের জন্য সাক্ষরতা হার মোটেও সন্তোষজনক নয়। বিবিএস-এর হিসেব মতে এখনও দেশের ৪০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। গত বছর ইউনেস্কো প্রকাশিত 'সবার জন্য শিক্ষা: বিশ্ব পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন' অনুসারে পৃথিবীর যে দশটি দেশে বিশ্বের ৭২ ভাগ নিরক্ষর লোক বাস করে বাংলাদেশ তার মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ফলে সহজেই অনুমেয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি আছে তা বাস্তবায়ন এখন সত্যই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

কিন্তু আশার কথা, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রণীত হতে যাচ্ছে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪'। যেখানে বলা হয়েছে "যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করেন বা এই আইনের দায়িত্বপালনকারী কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে উহা একটি অপরাধ"। তাই আমরা আশা করতে পারি যে, 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন" চালু হলে এই আইনকে কাজে লাগিয়ে আমরা শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হব। এছাড়া এই আইন চালু হলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমতায়ন নিশ্চিত করা হবে। এই আশার স্বপ্নকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশে এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৫ উদযাপন হলো।

জাতীয়ভাবে আয়োজিত কর্মসূচি:

বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পিত কর্মসূচি

- ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।
- আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন পর্যন্ত একটি র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।
- দিবসটি উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৭ সেপ্টেম্বর ১টি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
- আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস যথাযথভাবে পালনের জন্য জেলা, উপজেলা ও স্কুল পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর চিঠি পাঠানো হয়।
- ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন স্থানে সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণের জন্য ব্যানার তৈরি করা হয়।
- জেলা উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালী, পথ নাটক, জারীগান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।
- আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযান, সেভ দ্য চিলড্রেন, ব্র্যাক, ইউনেস্কো ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন-এর সহযোগিতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পোস্টার, ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে টেলিভিশন ও রেডিওতে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্যের উপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগ

- দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৫ উদযাপনের লক্ষ্যে অভিযানের সহযোগী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা ও উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়।
- পরিকল্পনা সভায় অংশগ্রহণকারী সকলের মতামতের ভিত্তিতে স্থানীয় কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়।
- চাহিদা প্রদান ও প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত পোস্টার গণসাক্ষরতা অভিযান তার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সারা দেশে বিতরণ করা হয়।
- বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত কর্মসূচির সাথে একাত্মতা প্রকাশ এবং এসব কর্মসূচিতে অভিযানের সদস্য ও সহযোগী সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।
- মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের র‍্যালিতে বিতরণের জন্য ১৫০০টি ক্যাপ তৈরি এবং পোস্টার ও স্মরণিকা প্রকাশের বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত সভা ও সমাবেশ থেকে প্রণীত কতিপয় সুপারিশ

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে এসব শিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারণ করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- সাধারণ শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতে হবে।
- বয়স্ক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিত জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের অবসর সময়কে অর্থপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা নিতে হবে।
- স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অবকাশের সময়টাকে নিজের এলাকার সাক্ষরতা অভিযানে কাজে লাগাতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- দক্ষ শ্রমজীবী, পেশাজীবী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারী-বেসরকারী ও পেশাজীবী সংগঠনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনগুলিতে পর্যাপ্ত এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং তা অব্যাহত রাখতে হবে।
- বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি ট্রেড-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে তার পরিবারের নিরক্ষর সদস্যগণকে সাক্ষরতা দান করতে হবে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সক্রিয় ও গতিশীল সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে।
- সরকারকে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনভিত্তিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- বয়স্ক শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। দলীয় শিখন এবং আনন্দদায়ক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে।
- বয়স্ক শিক্ষার্থীদের উপ-বৃত্তির আওতার মধ্যে আনতে হবে এবং এ বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে।
- সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষার ওপর জোর আরোপ করতে হবে।
- শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিবসে নিরক্ষর লোকদের অংশগ্রহণ করতে হবে।
- কর্মমুখী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রতিটি উপজেলায় বেসিক লিটারেসি প্রোগ্রাম (বিএলপি) চালু করতে হবে।
- গৃহকর্মীদের জন্য অবসরে শিক্ষা দেয়া যায় এমন শিক্ষা কেন্দ্র চালু করতে হবে।
- টেকসই সাক্ষরতার জন্য দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি চালু করতে হবে।
- শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য পোষ্টার, রিক্সা প্লেটন লিখন, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- বয়স্কদের শেখার উপযোগী উপকরণ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে ।
- দিবস উদযাপনে আরো বেশী ইভেন্ট যেমন-স্কুল ভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, পথনাটক ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।
- গ্রামে গঞ্জে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সাক্ষরতার সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।
- নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য এলাকায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আদিবাসীসহ সকলের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশু শ্রম বন্ধ এবং শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- স্কুলের সময়সূচি স্থানীয় বাস্তবতার নিরিখে নির্ধারণ করতে হবে।

রেহানা বেগম

উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান

দেশে সাক্ষরতার হার ৬১ শতাংশ

দেশে এখন সাক্ষরতার হার ৬১ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপের তথ্য উদ্ধৃত করে গতকাল রোববার এ কথা বলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, প্রাথমিকে উপবৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও ৫২ লাখ বাড়ানো হচ্ছে।

আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গণশিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। তবে সাক্ষরতার হার নিয়ে এর আগে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিব ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন।

গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গত বছর সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, দেশে সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। ওই সংবাদ সম্মেলনেই তৎকালীন প্রাথমিক ও গণসচিব কাজী আখতার হোসেন বলেছিলেন, সাক্ষরতার হার ৭০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তবে ২০১৩ সালে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন বলেছিলেন, সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ।

গতকাল প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী গড় সাক্ষরতার হার ৬১ শতাংশসহ বিভিন্ন বয়সীদের সাক্ষরতার হার তুলে ধরেন। তিনি বিবিএসের যে জরিপের কথা বলেছেন, সেটির তথ্য ২০১৩ সালের হলেও প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে গত জুনে।

বিবিএসের এ জরিপ বলছে, ২০১২ সালে ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার ছিল ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ, ২০১১ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ ও ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

প্রথম আলো ০৭.০৯.২০১৫

সংকট কেটেছে ঠিক সময়ে বই দেওয়ার আশা

বিশ্বব্যাংকের শর্ত আংশিক মেনে নিয়ে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপতে রাজি হয়ে কাজ পাওয়ার চিঠি (নোটিশ অব অ্যাওয়ার্ড) নিয়েছেন মুদ্রণকারীরা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গতকাল রোববার এ তথ্য জানিয়ে বলেন, এখন বই ছাপার কার্যাদেশ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। মুদ্রণকারী জামানতের টাকা জমা দিলেই কার্যদেশ দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ প্রসঙ্গে বলেন, পাঠ্যবই নিয়ে একটি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সব পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি হয়েছে। মুদ্রাকররা ইতিমধ্যে কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিয়েছেন। সময়মতো দেশের সব শিক্ষার্থী বই পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। গত সোমবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের মধ্যস্থতায় দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রণকারী-উভয় পক্ষই নিজ নিজ অনড় অবস্থান থেকে সরে আসে। তখন বিশ্বব্যাংক মান যাচাইয়ের পর বিল দেওয়ার শর্ত থেকে সরে এসে জামানত ফি ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ রাখার শর্তে অনড় থাকে। এ বিষয়টি মুদ্রণকারীরাও মেনে নিয়ে কাজ করতে রাজি হন।

গতকাল এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন বই ছাপার কার্যদেশ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তাঁরা আশা করছেন, ১ জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

এবার অবিশ্বাস্য কম দর দিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতা হয়ে প্রাথমিকের পাঠ্যবই ছাপার কাজ নেওয়ার আয়োজন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন বিশ্বব্যাংক কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেয়। অন্যতম শর্ত হলো বই ছেপে সারা দেশে পৌঁছার পর সেই বইয়ের নমুনা সংগ্রহ করে মান নিশ্চিত হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের পর বিল পরিশোধ করা এবং জামানতও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এতে বেঁকে বসে সবনিম্ন দরদাতা হওয়া মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা ঘোষণা দেয়, শর্ত মেনে তারা কাজ করবে না। এ রকম পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দুই পক্ষ ছাড় দেয়।

প্রথম আলো ০৭.০৯.২০১৫

ক্লাস ওয়ানে ভর্তি পরীক্ষা অযৌক্তিক

ক্লাস ওয়ানে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার কড়া সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এটা একেবারেই অযৌক্তিক। তিনি বলেন, যখনই একটি শিশু ভর্তির বয়স হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। এটা তার অধিকার। পরীক্ষা দিয়ে তাকে ভর্তি হতে হবে কেন? গতকাল সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের উদ্বোধনী আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন।

শিশুদের ওপর বই এবং পড়াশোনাকে বোঝা হিসেবে চাপিয়ে না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে শিক্ষকদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, শিশু যদি ছাপানো প্রশ্নপত্র পড়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার মতো জ্ঞানই অর্জন করে ফেলে, শিশুকে যদি সব শিখেই স্কুলে ভর্তি হতে হয়, তাহলে আর স্কুলে পড়াবেন কী? তিনি বলেন, শিশুর কাঁধে সব কিছু এখন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এত বেশি হোমওয়ার্ক দেওয়া হয় যে, স্কুলে ঢোকার পরদিনই স্কুল সম্পর্কে শিশুদের ভীতি সৃষ্টি হয়ে যায়। এ বিষয়টাও দেখা দরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা বাচ্চা ৫ বছর বয়সে স্কুলে গেল, তখনই তাকে সব বিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে তা নয়। শিশুদের যেন পড়াশোনার প্রতি অনিহা সৃষ্টি না হয় বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বাচ্চারা তাড়াতাড়ি শেখে। কিন্তু আগেই যদি বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ধীরে ধীরে পড়াশোনার প্রতি একটা অনিহা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রতি শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সরকারি স্কুলগুলোকে অবকাঠামোগত ও শিক্ষার মানগত দিক থেকে আরও উন্নত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। দেশকে নিরক্ষতামুক্ত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি তিনি বলেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর আলোকে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করুন। আপনাদের সব কাজে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সমর্থন ও সহযোগিতার দ্বার অবারিত থাকবে।

আমাদের সময় ০৯.০৯.২০১৫

শিক্ষার্থী ৩৫ জনের কম হলে পার্শ্ববর্তী স্কুলে সংযুক্তি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ৩৫ জনের কম হলে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করা হবে। জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং সংস্কার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিটি বিদ্যালয় সংস্কার করা হবে। ইতিমধ্যে জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলোর সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত রাজধানীর ১২টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয় সংস্কারে সর্বনিম্ন ৪০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা হবে।

মন্ত্রী গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে সরকারের অগ্রাধিকার খাতগুলোর উল্লেখযোগ্য অর্জন তুলে ধরার লক্ষ্যে ডিজিটাল 'দিন বদলের অভিযানের' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। বাংলাদেশ ফোরাম এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সময়কাল ১৩.০৯.২০১৫

বাংলাদেশে শিশুমৃত্যু কমেছে দুই-তৃতীয়াংশ

১৯৯০ সালের তুলনায় শিশুমৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনতে পেরেছে যে ৬২টি দেশ, বাংলাদেশ তার একটি। বাংলাদেশে প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার এখন ৩৮।

গতকাল বুধবার প্রকাশিত জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) একটি অগ্রগতি প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে দেশগুলো এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পেরেছে, তার ২৪টি নিম্ন ও নিম্ন আয়ভুক্ত দেশ।

'কমিটিং চাইল্ড সারভাইল: এ প্রমিজ রিনিউড' শীর্ষক এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৫ বছর ধরে গোটা বিশ্ব শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার কাজ করেছে। ১৯৯০ সালের তুলনায় পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার এখন ৫৩ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। একই সময়ে নবজাতকের মৃত্যু হার কমেছে ৪৭ শতাংশ পর্যন্ত। তবে প্রতিবেদনে ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্থনি লেক বলেছেন, এত অগ্রগতির পরও বিশ্বে প্রতি মিনিটে ১১টি শিশু মারা যাচ্ছে। এ মৃত্যু একটু চেষ্টা করলেই এড়ানো যেত। তিনি বলেন, মায়েদের গর্ভকালীন সেবা থেকে টিকা ও পুষ্টিসেবা একেবারে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারলে শিশুমৃত্যুর হার কমবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি শিশুর মৃত্যু হচ্ছে যে দেশগুলোতে, সেগুলো সাব-সাহারা ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ। প্রতি পাঁচটি মৃত্যুর চারটিই ঘটেছে এ অঞ্চল দুটিতে।

অগ্রগতি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি শিশুর মৃত্যু হয় অ্যাঙ্গোলায়। এ তালিকায় ৬১তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। প্রতি হাজারে বাংলাদেশে এখন শিশুমৃত্যুর হার ৩৮। ১৯৯০ সালে ছিল প্রতি হাজারে ১৪৪, ২০০০ সালে ছিল ৮৮। সামগ্রিকভাবে শিশুমৃত্যুর হার প্রতিবছরে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ হারে কমেছে। তবে এখনো যত শিশু মারা যাচ্ছে, তার বড় অংশ নবজাতক। ১৯৯০ সালে মোট শিশুমৃত্যুর ৪৪ শতাংশ ছিল নবজাতক। এখন এ হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ শতাংশে।

শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে শ্রীলঙ্কা। প্রতি হাজারে দেশটিতে এখন শিশুমৃত্যুর হার ১০। তালিকায় নেপাল ও ভুটান বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আছে। পেছনে আছে ভারত, মিয়ানমার, পাকিস্তান ও আফগানস্তান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলো এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পেরেছে। অন্য অঞ্চলগুলো যদি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারত, তাহলে গত ১৫ বছরে আরও ১ কোটি ৪০ লাখ শিশুর জীবন বেঁচে যেত।

ইউনিসেফ বলেছে, শিশুরা শুধু সেপসিস বা ম্যালেরিয়ায় মারা যাচ্ছে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে শিশুরা মারা যাচ্ছে তাদের পরিবারগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইউনিসেফ বলেছে, শিশুমৃত্যুর হার শুধু কমলেই চলবে না, বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বৈষম্য বা দেশের ভেতরে ধনী ও দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে যে বৈষম্য, তা দূর করতে হবে।

প্রথম আলো ১০.০৯.২০১৫

এখনো অনেক অর্জন বাকি

জাতিসংঘ প্রণীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে ভালো করলেও বাংলাদেশের এখনো অনেক অর্জন বাকি। অবশ্য কিছু কিছু লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে বাংলাদেশ।

'এমডিজি অর্জন: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৫'-এ পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল বুধবার এ প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, 'এমডিজির যে লক্ষ্যগুলোতে আমরা পিছিয়ে আছি, সেগুলোর প্রতি এখন বিশেষ নজর দিতে হবে।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান।

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য এম শামসুল আলম।

চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলকরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, লৈঙ্গিক সমতায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুর মৃত্যুহার কমানো, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস-ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ দমন, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারি গড়ে তোলা- এমডিজির এই আট লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

প্রথম আলো ১৭.০৯.২০১৫

১২ ছিট মহলে প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে

পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার ১২টি ছিটমহলে জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। গতকাল মঙ্গলবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এ তথ্য জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

বৈঠকের কার্যপত্র থেকে জানা যায়, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার পানিসালা, লতামারী, ভোটবাড়ী ও বাঁশকাটা গ্রামে; পঞ্চগড়ের সদর উপজেলার গারাতি; দেবীগঞ্জ উপজেলার বেউলাডাঙ্গা, দহলা খাগড়াবাড়ী, বালাপাড়া খাগড়াবাড়ী ও কোটভাজনী গ্রামে এবং কুড়িগ্রাম জেলার কালীরহাট, কামালপুর ও বানিয়াটারী গ্রামে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে এসব বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

মন্ত্রণালয় জানায়, ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরে ৭০ লাখ বই কম ছাপা হচ্ছে। বইয়ের মান বজায় রাখতে গিয়ে বিভিন্ন রকম তদারকির কারণে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। প্রতিবছর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য ১১ কোটির বেশি বই ছাপতে হয়। বিভিন্ন সময়ে এসব বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেজন্য মন্ত্রণালয় এবার বিষয়টি কঠোরভাবে তদারক করেছে।

মন্ত্রণালয় বলেছে, এ বছর ৩৩ শতাংশ কম দামে বই ছাপার দর পাওয়া গেছে। এতে ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। গত ৩১ আগস্ট ২২টি প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংসদীয় উপকমিটি দুর্নীতি রোধ ও মানসম্মত বই নিশ্চিত করতে ছাপার কাজ নিয়মিত তদারক করবে।

সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে, সংসদীয় কমিটি বৈঠকে ২০১৬ সালের প্রথম সপ্তাহে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কাজ শুরু করার সুপারিশ করে। নদীর চড়ায় অবস্থিত এলাকা, হওর ও চা-বাগান এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ এবং এসব এলাকায় বহিরাগত শিক্ষকদের মূল বেতনের সঙ্গে ১০ শতাংশ হারে ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

প্রথম আলো ৩০.০৯.২০১৫

পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীদের সাথে গণসাক্ষরতা অভিযানের একাত্মতা

সিলেট শহরের সন্নিকটবর্তী অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাতারগুল। এই অপূর্ব সুন্দর একটি জায়গা বহুকালধরে আশেপাশের মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। রাতারগুলের কথা আজ দেশবাসী প্রায় সবাই জানে কিন্তু সেই জানার কারণ এর সৌন্দর্য নয়।

সম্প্রতি রাতারগুল বন রক্ষার নামে বাংলাদেশ বন বিভাগ এক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প নিয়ে সিলেটসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের পরিবেশপ্রেমী মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এই অনাদি ঐতিহ্যকে বিজ্ঞানসম্মত ও পরিবেশসম্মতভাবে রক্ষার জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন মহল থেকে নানাভাবে আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে কিন্তু এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কোন ধরনের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাতারগুলকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা-র উদ্যোগে একটি ব্যতিক্রমী সমাবেশ আয়োজন করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নে অবস্থিত জলাবন রাতারগুলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে এক সংহতি সভায় সিলেট এবং ঢাকার বিশিষ্ট সুধীজনেরা অংশগ্রহণ করেন।

এই বিচিত্র সমাবেশের নাম দেয়া হয় 'ভাসমান নৌ-সভা'। গণসাক্ষরতা অভিযান পরিবেশ আন্দোলন কর্মীদের সাথে এই আন্দোলনে একত্মতা জানায় এবং সমাবেশে যোগদান করে।

শনিবার সকাল ৯টায় নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে যাত্রা শুরু করে সাড়ে ১০ টা থেকে ঘন্টাব্যাপী বন পরিদর্শন করেন পরিবেশ আন্দোলনকারী উচ্চ পর্যায়ের এই পরিদর্শক দলটি। পরে রাতারগুল বন পাশ্ববর্তী শিয়ালীছড়া জলমগ্ন মাঠে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় আয়োজিত ভাসমান নৌসভায় অংশগ্রহন করেন তাঁরা। এই পরিদর্শক দলের নেতৃত্ব দেন বাপা সহ-সভাপতি এবং তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাইন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী খলিকুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী, নারীনেত্রী খুশী কবির, বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বনবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নারায়ন সাহা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. নাজিয়া চৌধুরী, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল হাকিম চৌধুরী, বাপা সিলেট শাখার সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ই ইউ শহীদুল ইসলাম, নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ডিন ড. এম এ মজিদ, বাপা'র আদিবাসী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক সমন্বয়ক ফাদার জোসেফ গোমেজ, বাপা সিলেট শাখার সদস্য সচিব আব্দুল করিম কিমসহ আরো অনেকে। সমাবেশে অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, রাতারগুলে আগে অনেক বন্যপ্রাণী দেখা গেলেও আজকে কোন বন্যপ্রাণীর চিহ্ন দেখা যায়নি। এখানে সংরক্ষণের নামে বনবিভাগ নির্মিত ওয়াচ টাওয়ার এই বনের বৈশিষ্ট্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও দৃষ্টিকটু।

রাতারগুলকে শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাইন্ডেশনের

চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠার নামে বন বিভাগ রাতারগুল ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত না নিয়ে বন বিভাগের এমন কাজের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। শরীফ জামিল ২০১২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাতারগুল সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ড সভায় তুলে ধরে বলেন, পরিবেশবাদী ব্যক্তি ও সংগঠনের পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয়ে একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি সংরক্ষণ প্রয়োজন। সভায় বাপার সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতিন জানান, এই সফর শেষে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে রাতারগুল রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ করে একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হবে।

ফারদানা আলম সোমা

মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার

এনডিএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে গত ৩১ শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখে দিনাজপুর জেলায় 'আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা: আমাদের করণীয়' শীর্ষক মাতৃভাষভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক একটি আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব মো. শফিকুল ইসলাম। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন অধ্যক্ষ বিজয় বিকার ডিকসা, নরেশ বিশরা , লাকি মারাণ্ডি, এনজিও কর্মী আব্দুস সালাম ও আব্দুল হামিদ, সাইফুল ইসলাম, ডা.শ্যাম মান্ডি, শিক্ষক পিটার লাকরা। সেমিনারে বক্তারা বলেন, একটি দেশের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। জাতি

গঠনে প্রধান মাধ্যম হলো শিক্ষা। আদিবাসীদের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ হলো শিশু কিশোর। মূল স্রোতোধারার মানুষের তুলনায় আদিবাসীদের সংখ্যা কম হলেও দেশ গড়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ভাষা ও গোত্র আলাদা যা বাংলা ভাষার সাথে কোন মিল নেই। তাই আদিবাসী ছেলে মেয়েদের মূলত: প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা লাভের সুযোগ নেই বললেই চলে। আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা অধিকার আদায়ের বাধা উত্তরণের উপায় হলো মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা ।

এনডিএফ এর পরিচালক ভিক্টর লাকরার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তৌহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি) বলেন, আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার যে সমস্যা এটি অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। তিনি বলেন বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে আদিবাসী শিশুদের জন্য ৫টি ভাষায় প্রি-প্রাইমারি উপকরণ উন্নয়নের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়ার পথে। আশা করা হচ্ছে আগামী ২০১৬ সালে শিশুদের হাতে উপর্যুক্ত উপকরণ পৌঁছাবে।

মো. শাহ্ আলম

মতবিনিময় সভা

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা: সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ

৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের মিলনায়তন-এ গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগী সংগঠন স্ব-উন্নয়ন-এর সহযোগিতায় শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সুশাসন ও জনঅংশগ্রহণ-এর ভূমিকার বিষয়ে "সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা: সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন সুপারিশমালা গ্রহণ করা হয়।

রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোঃ নূরল আলমের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনার এবং বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. সাইদুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন স্ব-উন্নয়নের সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক মুস্তাফিজুর রহমান খান। সভায় বিশিষ্ট শিক্ষা বিষয়ক গবেষক ও নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবু জায়েদ মোহাম্মদ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি প্রথমেই বাংলাদেশে শিক্ষার সফলতার দিকগুলো এবং মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অন্তরায়গুলো তুলে ধরেন। অন্তরায়গুলোর জন্য তিনি আমাদের দেশের শিক্ষায় সুশাসনের অভাব ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয়করণকে দায়ী করেন।

প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন *দৈনিক সোনার দেশ* পত্রিকার সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) আকবারুল হাসান মিল্লাত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শুভ্রা চৌধুরী । আলোচকবৃন্দ বলেন, শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসন বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। এছাড়া অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস মোঃ আবুল কাশেম, জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম ও রাজশাহী আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপ-প্রধান কর্মকর্তা ড. বিধান চন্দ্র কর্মকার। সভায় গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচের সদস্যবৃদসহ প্রায় ১০০জন অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো উঠে এসেছে তা হলো, বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সামাজিক জবাবদিহিতার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত ও সুবিধাভোগীদের সন্তুষ্টির মাত্রা নিরূপন করা, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে শক্তিশালী ও রাজনীতিমুক্ত রাখা, স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা,স্থানীয় সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটিকে আরো শক্তিশালী করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যথাযথ মনিটরিং বৃদ্ধি করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রেহানা বেগম

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৫ বিষয়ক পরিকল্পনা সভা

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে কমিউনিটি ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ গণসাক্ষরতা অভিযান কার্যালয়ে Post-EFA Framework and Sustainable Development Goals বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা এবং বিশ্ব শিক্ষক ২০১৫ কে সামনে রেখে একটি পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ থেকে আমাদের অর্জন ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং রূপকল্প ২০৩০ এর জন্য প্রস্তাবিত ১৭টি লক্ষ্য, ১৬৯টি টার্গেট ও ৫টি মুখ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইনচিয়োন সম্মেলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মনজুর আহমদ, ভাইস চেয়ার, গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিল, জনাব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, সদস্য, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি, জনাব মোস্তফা মল্লিক, সিনিয়র ষ্টাফ করসপন্ডেট, চ্যানেল আই, জনাব শহীদুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার, ইউনেস্কো, জনাব নাফিস উদ্দিন খাঁন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং ১৫টি শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ মোট ৬৫ জন।

Empowering Teachers, Building Sustainable Societies এই শ্লোগান কে সামনে রেখে এবারের বিশ্ব শিক্ষক

দিবস উদযাপিত হবে। এ সংক্রান্ত আলোচনা সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

- এ বছর ১৫টি জেলায় শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে এবং শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হবে;
- জাতীয় পর্যায়ে দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকে র‍্যালী ও আলোচনা সভা আয়োজন করা যেতে পারে;
- ইউনেস্কোর প্রকাশিত পোস্টারের আলোকে বাংলায় অনুরূপ ১০,০০০ পোস্টার ছাপানো যেতে পারে;
- এ দিবসের প্রতিপাদ্য নিয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল-এ দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে টক শো আয়োজন করা যেতে পারে এবং শিক্ষক দিবসের দাবিগুলো নিয়ে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্যেশ্যে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র (Supplements) অথবা উন্মুক্ত আবেদন (Open Appeal) প্রকাশ করা যেতে পারে;
- নির্বাচিত শিক্ষক সংগঠনসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা, পোষ্টার প্রদর্শন ও বিতরণ, শিক্ষক সম্বর্ধনা ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজন করতে পারে। এছাড়াও সহযোগী সংগঠন/স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;
- এই কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের প্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ/জনপ্রতিনিধি/শিক্ষাবিদ/নীতিনির্ধারকসহ সিভিল সোসাইটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং শিক্ষক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

সামছুন নাহার বেগম কলি

মতবিনিময় সভা

প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা : আমাদের করণীয়

প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের ধারণা বিকাশ ও সচেতনতা সৃষ্টিকল্পে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ গাইবান্ধা জেলায় ইসিসিই বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে আয়োজন করে 'প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা: আমাদের করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব জহুরুল কাইয়ুম, উপাধ্যক্ষ, সাদুল্লাপুর ডিগ্রী কলেজ। তিনি প্রবন্ধে শিশুর সঠিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো এবং প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষায় গাইবান্ধার চিত্র তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথি জনাব আসাদুজ্জামান চৌধুরী, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, গাইবান্ধা বলেন, প্রাক শৈশব শিক্ষা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটানো, তাদেরকে সামাজিক, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে পরিবারের, বাব-মা ও শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব গোবিন্দ লাল দাশ, প্রধান উপদেষ্টা, গাইবান্ধা প্রেসকাব। উল্লেখ্য, মতবিনিময় সভা উপলক্ষে প্রাক-শৈশব শিক্ষা ও যত্ন বিষয়ে সচেতনতাধর্মী একটি পোষ্টারও প্রকাশ করা হয়। মতবিনিময় সভায় বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু জাফর সাবু, শিশু সংগঠক ও কেএম রেজাউল হক, সভাপতি প্রেসকাব, গাইবান্ধা। এছাড়া শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ মোট ৮০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

মিজানুর রহমান আকন্দ

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টারে "প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা" বিষয়ক একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করে গণসাক্ষরতা অভিযান। প্রাথমিক শিক্ষায় জনগণের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলাদেশের ৮টি জেলার ৮ টি স্থানীয় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর কর্যক্রম সুবিস্তৃত বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যালয়সমূহের সার্বিক মান উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যালয়ের শিখন পদ্ধতির মান উন্নয়নের করে একটি কার্যকর প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক জনাব তপন কুমার দাশ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন- গণসাক্ষরতা অভিযান কার্যক্রমের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সবার অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে এক ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও সকল মহলে বিশেষ করে শিক্ষক, এসএসসি, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসন সবাই মিলে একসাথে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন-"আমি আজ গর্বিত, কেননা আমি নিজে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার একজন মানুষ। আমার এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী-কে আমি ধন্যবাদ জানাই। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নে জনগণকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এতে শিশুরা বিদ্যালয়মুখী হচ্ছে"। তিনি এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও চলমান রাখার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ বলেন, "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে আমি অবগত রয়েছি এবং দুই একটি কার্যক্রমে আমি নিজে উপস্থিত থেকেছি। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গৃহীত এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে"।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট ও এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল হালিম বলেন, আমি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার বাইরে বিদ্যালয়সমূহের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রতি বিদ্যালয়ে প্রায় ৯৫% শিক্ষার্থীই উপস্থিত থাকে, শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজে অংশ নেয়, শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহার করে এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী সমাপনী বক্তব্যে বলেন, "আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে তথাপিও আরো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করতে হবে। আজকের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা সারা দেশে বাস্তবায়নে আমাদের সহায়তা করবে"। তিনি আরও বলেন, "জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিদ্যালয়সমূহকে শিশু বান্ধব, আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক বা যে কোন প্রকার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়"। তিনি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তাছাড়াও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং ৮টি সহযোগী সংস্থা থেকে ৮ জন তাদের মত ব্যক্ত করেন। তাঁরা সকলে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক ওরিয়েন্টেশন ও বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা চর্চা কালে বিদ্যালয়ে কি কি পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয় আলোকপাত করেন।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষা গবেষক, জাতীয় ও আন্তজাতিক পর্যায়ের এনজিও, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও দাতাসংস্থার প্রতিনিধি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার প্রতিনিধিরা এ সভায় অংশগ্রহণ করেন ।

মোঃ মেহেদী হাসান

সমন্বয় সভা
কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সকাল ১০:০০ টায় গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বিষয়ে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক জনাব কে. এম এনামুল হক। এছাড়া সভায় ৮টি জেলায় পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংগঠনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও নির্বাহী পরিচালক এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রতিনিধি সহ মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় Manegment Information System (MIS), বিল ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ভ্যালু ফর মানি এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তাহলো,

- ইউনিয়নভিত্তিক প্রতিবন্ধী শিশুদের তালিকা তৈরি, কতজন স্কুলে যায় অথবা যায় না এবং এই শিশুদের স্কুল উপযোগী তৈরি করে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া;
- বেইস লাইন-এর আওতায় ইউনিয়নের প্রতিটি স্কুলের অনুপস্থিত শিশুদের তালিকা প্রকাশ করেন যেখানে কমিউনিটি ও শিক্ষকরা এক সাথে কাজ করে শিশুদের স্কুলমুখী করার উদ্যোগ নিতে পারবেন;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের নিজস্ব অফিস স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ ও সম্মানী প্রদান;
- বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক পদ খালি না রেখে শিক্ষক নিয়োগ করা;
- মা সমাবেশে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, সংগঠনের প্রতিনিধি অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের প্রতিটি কর্মকান্ড যেন PEDP-III কে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

উম্মে সাইকা

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পরিকৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর Phase-6-এর পরিকৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে অভিযানের সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে দেশের ৭টি বিভাগে বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ঢাকায় এনজিও ফোরাম এন্ড পাবলিক হেলথ-এর প্রশিক্ষণ সেন্টারে ইনক্লুসিভ এডুকেশন কার্যক্রমসম্পন্ন সংঠন ও শিক্ষক ইউনিয়নের ২২ জন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অভিযানের পরিকৌশলগত পরিকল্পনার ধারণা প্রদান, অভিযানের প্রধান অর্জন, অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতে আর কি কি বিষয়ে ওপর অভিযানের কাজ করা উচিত সেই সংক্রান্ত সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়। নিম্নে মোটা দাগে অভিযানের অর্জনসমূহ তুলে ধরা হল,

- বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশেষ করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনাকারী এনজিওসমূহের সকল শিক্ষার্থীরা যাতে বিনামূল্যে বই পায় সে বিষয়ে সরকারের সাথে এডভোকেসি গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি সফল কাজ ছিল।
- অভিযান প্রতি বছর একটি এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশ করে যা থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত মৌলিক শিক্ষার বিভিন্ন পরিসরে কতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা জনসাধারণ, সরকার, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ অভীষ্টজনরা অবহিত হন ও বিভিন্ন কাজে তারা রিপোর্টটি ব্যবহার করে থাকেন।
- অভিযান বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে অংশীজনদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে থাকে,
- শিক্ষক ইউনিয়নের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজও করে,
- অভিযানের প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের উপকরণ (ইসিডি, অব্যাহত শিক্ষা), শিক্ষা কার্যক্রমসম্পন্ন এনজিও ডিরেক্টরী ইত্যাদি।
- প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও ঝরেপড়া রোধের জন্য ৮ টি জেলার ৩২ ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তৈরি করেছে গণসাক্ষরতা অভিযান।
- গণসাক্ষরতা অভিযান বিভিন্ন বিশেষ দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে।

কর্মশালায় ইনক্লুসিভ এডুকেশন কার্যক্রসম্পন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যাতে সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার পায় সেজন্য অভিযানের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন।

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের উপর্যুক্ত বই প্রণয়নে সরকারের সাথে এডভোকেসি করা;
- প্রতিটি স্কুলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কাজ করা ও তাদের উপযুক্ত শ্রেণীকক্ষের জন্য এডভোকেসি করা;
- বিভিন্ন রিসার্চ রিপোর্টে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ইস্যুগুলো তুলে আনা;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি।

জয়া সরকার

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

অনুবাদ, রূপান্তর ও প্রকাশে: ঢাকায় জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র (ইউনিক) ও দায়েমী ফাউন্ডেশন।

United Nations Information Centre Dhaka

Dayemi Foundation
Support Educate Empower

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
UN in collaboration with Project Everyone.

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৫৬ আশ্বিন ১৪২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস সংখ্যা

সম্পাদক

বাংলাদেশে প্রকৃত সাক্ষরতার বিষয়ে পুরনো বিতর্কটা আবার সকলের সামনে এসেছে। ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বিষয়টা যে খুবই প্রাসঙ্গিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে সাক্ষরতা অর্জনের এই হার ৬১% শতাংশ বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। সরকারি সূত্রে এই হার অন্তত আরো চার বা পাঁচ ভাগ বেশি এমন কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে বিশেষভাবে উচ্চকণ্ঠ নয়। এই বাস্তবতা একদিক থেকে যেমন ভাল, তেমনি যথার্থ বিচারে কিন্তু মন্দ।

ভাল এই জন্য যে, সরকারি মনোমত ভাষ্যের সঙ্গে না মিললে তা অস্বীকার করার একটি প্রবণতা আমরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই লক্ষ করে থাকি। এবার ঠিক তেমনটা ঘটেনি। আবার মন্দ বলার কারণ হল, গত প্রায় এক দশক ধরে আমাদের সাক্ষরতার হার যে, ষাটের আশেপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা তো কোন বিচারেই সুখকর সংবাদ হতে পারে না। শিক্ষা ও অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আমরা যদি প্রায় শত ভাগ শিশুর প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জনের ব্যর্থতা তো ওই ব্যাপক সাফল্যের গায়ে কিছুটা কালিমা লেপন করে। গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব তো হওয়া উচিত, সাক্ষরতা পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান উন্নতির বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতি বছরই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাক্ষরতা দিবসের জাতীয় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে থাকেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই তাৎপর্যবহ সভায় নিরক্ষরতা দূর করার জন্য অঙ্গীকার উচ্চারিত হয়। ভাবতে কষ্ট লাগে, প্রধানমন্ত্রীর এমন অঙ্গীকার পালনে সারা বছর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তেমন কোন সক্রিয় উদ্যোগ নেয় বলে আমাদের মনে হয় না। একথা আবশ্যিকভাবেই স্বীকার করতেই হবে অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপকভাবে জাতীয় পরিষেবা প্রদানের জন্য যে কর্মোদ্যোগ আমাদের চোখে পড়ে, সাক্ষরতা বিষয়ে তেমন তৎপরতা বিগত কয়েক বছরে চোখে পড়েনি। বিষয়টি যে অত্যন্ত উদ্বেগ ও পরিতাপের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা নিয়ে আলাদা কর্মসূচির কোন সন্ধান আর পাওয়া যায় না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিদপ্তরের কর্মব্যাপ্তি বৃদ্ধির পর বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা আছে। এই সমস্যাটি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করা উচিত বলে আমরা মনে করি। পর্যায়ক্রমে ঠিক কী কী সুচিন্তিত ও বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নিলে আমাদের সাক্ষরতার হার কোন সাল নাগাদ অন্তত ৭০ বা ৭৫ ভাগে উপনীত হবে, এ বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাক্ষরতার বিষয়ে আমাদের মনোযোগ সত্যিই আন্তরিক ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক নয়। মধ্যম আয়ের পংক্তি স্পর্শ করা একটি দেশের জন্য এটা যে লজ্জার, তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। সাক্ষরতা বিষয়ে আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ যদি প্রচলিত ধারায় চলতে থাকে, তা হলে সম্ভবত আমরা এই শতকের মাঝামাঝিও একটি সামগ্রিকভাবে সাক্ষর জাতি হিসেবে পরিচিতি পাব না।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স ম্যাসিভ, ১৫ মিরপুর রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ • ফোন: ৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১ • ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২ মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org